স্বামিজীর কথা

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার
কলিকাতা।

[মূল্য বার আনা

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ যাঁহাদের হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের, স্বামিজী সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পুরাতন 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছিল। তাহাই বর্ত্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে ও পরে স্বামিজীর জীবনের অনেক নূতন তথ্য পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন।

ইতি

প্রকাশক

সূচিপত্র

স্বামিজীর কথা

স্বামিজীর সহিত দুই চারি দিন

হে পাঠক, আমার স্মৃতির দুই এক পৃষ্ঠা যদি পড়িতে চাও ত একটু অপেক্ষা করিয়া প্রথমতঃ পূজনীয় স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার বোধাবোধ, বিদ্যা বুদ্ধি, স্বভাব প্রকৃতি, কিরূপ ছিল তাহার আভাষ একটু জানা আবশ্যক, নতুবা তাঁহার সহিত বসবাস ও কথোপকথনের যে কত দাম তাহা বুঝিতে পারিবে না। প্রথম জ্ঞানোদয় হইতে এন্‌ট্রেন্স পাশ করা পর্য্যন্ত (৫—১৮ বৎসর) ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বুঝিতাম না; কিন্তু চতুর্থ ক্লাসে উঠিতে না উঠিতেই ইংরাজী শিক্ষার ছিটে ফোঁটা গায়ে লাগিতে না লাগিতেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অনাস্থা জন্মিল। তবুও মিশনরী স্কুলে আমায় পড়িতে হয় নাই। এন্‌ট্রেন্স পাশ করার পর প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব হইল। তারপর কলেজে পড়িবার সময়, অর্থাৎ উনিশ হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ফিজিক্‌স (Physics), কেমিষ্ট্রী (Chemistry), জিওলজী (Geology),

বট্যানী (Botany) প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র একটু আধটু পড়িলাম এবং হক্স্লে, ডারউইন, মিল, টিন্‌ডল, স্পেনসার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিদ্বানগণের সহিত সম্বন্ধও একটু আধটু হইল। ফলে জ্ঞানের বদ্‌হজমে যাহা হয়,—ঘোর নাস্তিক হইলাম। কিছুতেই বিশ্বাস নাই, ভক্তি কাহাকে বলে জানি না এবং তখনকার-আমি যে, একটা হস্তপদ-বিশিষ্ট অতি গর্ব্বিত কিম্ভূত-কিমাকার জীববিশেষ ছিলাম এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন সকল ধর্ম্মেই দোষ দেখিতাম ও সকলকেই আপনাপেক্ষা হীন মনে করিতাম—এ ভাবটা অবশ্য মনে মনে থাকিত; প্রকাশ্যে কিন্তু, অন্যরূপ দেখাইতাম।

খৃষ্টান মিশনরীরা এই সময়ে আমার নিকটে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। অন্য ধর্ম্মের নিন্দাবাদ, এবং দাঁও প্যাঁচের সহিত অনেক তর্ক যুক্তি করিয়া অবশেষে তাঁহারা বুঝাইলেন যে, বিশ্বাস ভিন্ন ধর্ম্মরাজ্যে কিছুই হইবে না। খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করাটা পূর্ব্বে আবশ্যক তবেই ইহার নূতনত্ব ও অন্য সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব—বুঝা যাইবে। অদ্ভুত গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সে কথায় কিন্তু পাষণ্ডের মন গলিল না। পাশ্চাত্য বিদ্যার কৃপায় শিখিয়াছি, "প্রমাণ ভিন্ন কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না।" মিশনরী প্রভুরা কিন্তু বলিলেন, "অগ্রে বিশ্বাস পরে

প্রমাণ।” কিন্তু মন বুঝিবে কেন ? সুতরাং কথার জোরে তাঁহারা কোন মতে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা বলিলেন, “বাইবেল মন দিয়া সমস্ত পড়া আবশ্যক ; তাহা হইলেই বিশ্বাস হইবে।” আচ্ছা, তাহাই করিলাম। ভাগ্যক্রমে ফাদার রিভিংটন, রেভারেণ্ড লেট্‌ওয়ার্ড, গোরে ও বোমেণ্ট প্রভৃতি কতকগুলি বিদ্বান্ নিস্পৃহ ও বাস্তবিক ভক্ত মিশনরীরও সাক্ষাৎ লাভ হইল ; কিন্তু কোনরূপেই খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, “আমার অনেক উন্নতি হইয়াছে, ঈশার ধর্ম্মে বিশ্বাসও হইয়াছে, কিন্তু জাতি যাইবার ভয়ে খৃষ্টান হইতেছি না।” তাঁহাদের সে কথার ফলে ক্রমে অবিশ্বাসের উপরও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অবশেষে এই স্থির হইল যে, তাঁহারা আমার দশটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং প্রত্যেক প্রশ্ন যথাযথ সমাধানের পর আমার সাক্ষর লইবেন। এইরূপে যখন ১০ম প্রশ্নের উত্তরে আমি সাক্ষর করিব তখনই আমার হার হইবে এবং তাঁহারা আমাকে ব্যাপ্‌টিস্‌ম্ (Baptism) দিবেন বা তাঁহাদের ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিবেন। বলা বাহুল্য তিনটির অধিক প্রশ্নের সমাধান হইবার পূর্ব্বেই কলেজ ছাড়িয়া আমি সংসারে প্রবেশ করিলাম। সংসারে ঢুকিবার পরেও

সকল ধর্ম্মগ্রন্থাদিই পড়ি, কখন বা চার্চে, কখন বা ব্রাহ্মমন্দিরে, কখন বা দেবালয়ে যাই; কিন্তু কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোন্ ধর্ম্মই বা অসত্য, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টিই বা মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে স্থির হইল যে, পরলোক আছে কি-না, আত্মা অমর কিংবা মর, এ সকল কথা কেহই জানে না। তবে যে কোন ধর্ম্মেই হউক না কেন দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারিলে ইহ-জন্মে অনেকটা সুখ শান্তি থাকে। আর সেই বিশ্বাসটা মানুষের অভ্যাসেই দৃঢ় হইয়া থাকে। তর্ক, বিচার বা বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্মের সত্যাসত্য বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। ভাগ্য অনুকূল—প্রচুর বেতনের চাকুরিও জুটিল। তখন আমার অর্থেরও অনটন নাই, দশ জন লোকেও ভাল বলে; সুখী হইতে গেলে সাধারণ মানুষের যাহা আবশ্যক তাহার কিছুরই অভাব থাকিল না। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মনে সুখ শান্তির উদয় হইল না। কি একটা অভাবের ছায়া প্রাণে সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিল। এইরূপে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল।

* * * *

বেলগাঁ—১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থূলকায়

প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উকিল বন্ধুটি বলিলেন, "ইনি একজন বিদ্বান বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" ফিরিয়া দেখিলাম—প্রশান্ত মূর্ত্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, গোঁপ দাড়ি কামান, অঙ্গে গেরুয়া আল্‌খাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটি জুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ী, সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্ত্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি। দেখিয়া আনন্দ হইল—তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু তখন উহার কারণ জানিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হুঁকা নাই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।" তিনি বলিলেন, "তামাক, চুরুট যখন যাহা পাই তখন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।" তামাক সাজাইয়া দিলাম। তখন আমার বিশ্বাস, গেরুয়া বেশধারী সন্ন্যাসী মাত্রেই জুয়াচোর। ভাবিলাম, ইনিও

কিছু প্রত্যাশা করিয়া আমার কাছে আসিয়াছেন। তাহা ছাড়া উকিল বন্ধু মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, ইনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত মিল হওয়া কঠিন; তাই বোধ হয় আমার বাড়ীতে থাকিবার জন্য আসিয়াছেন। মনে এইরূপ নানা তোলপাড় করিয়া তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিষপত্র আমার বাসায় আনাইব কি-না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি উকিল বাবুর বাড়ীতে বেশ আছি। আর বাঙ্গালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে; কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন— অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।" সে রাত্রে বড় বেশী কথাবার্ত্তা হইল না; কিন্তু দুই চারি কথা যাহা বলিলেন তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমাপেক্ষা হাজার গুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোন না ও সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্বেও আমাপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী। বোধ হইল, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, কারণ স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা নাই। আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, "যদি চা খাইবার আপত্তি না

থাকে তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।” তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির সহিত তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম; মনে হইল—এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদা সন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ ত কখন দেখি নাই। মনে করিতাম,—যাহার পয়সা নাই তাহার মরণ ভাল, ; বাস্তবিক নিস্পৃহ সন্ন্যাসী জগতে অসম্ভব —কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া এতদিনে তাহাকে শিথিল করিল।

পর দিন ১৯শে অক্টোবর, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া স্বামিজীর পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামিজীর দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া, আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামিজী যেখানে ছিলেন তথায় গেলাম। গিয়া দেখি, তথায় মহা সভা; স্বামিজী বসিয়া আছেন ও নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান লোকের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্বামিজী কাহারও সহিত ইংরাজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটু মাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হক্স্লের ফিলজফিকে প্রামাণিক

মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামিজীর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীর ভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিয়া, অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মনুষ্য না দেবতা? কাজেই তাঁহার সমুদয় কথা মনে রহিল না। যাহা মনে আছে তাহার কয়েকটি লিখিলাম।

কোন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ উকিল প্রশ্ন করিলেন, "স্বামিজী, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত; আমরা তাহা বুঝি না। আমাদের ঐ সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি?"

স্বামিজী উত্তর করিলেন, "অবশ্যই উত্তম ফল আছে; ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ঐ কয়টি সংস্কৃত মন্ত্রাদি ত ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পার? তথাপি লওনা, ইহা কাহার দোষ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে পার তথাপি যখন সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বস, তখন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছি মনে কর, না—কিছু পাপ করিতেছ মনে কর? যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছি মনে করিয়া বস, তাহা হইলে উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট।"

অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিলেন, “ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন, ম্লেচ্ছ ভাষায় করা উচিত নহে; অমুক পুরাণে এইরূপ লেখা আছে।”

স্বামিজী উত্তর করিলেন, “যে কোন ভাষাতেই হোক্ ধর্ম্মচর্চ্চা করা যায়” এবং এই বাক্যের সমর্থনে শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণস্বরূপ দিয়া বলিলেন, “হাই-কোর্টের নিষ্পত্তি নিম্ন আদালত দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে না।”

এইরূপে নয়টা বাজিয়া গেল। যাঁহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামিজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ায়, পূর্ব্বদিনের চা খাইতে যাইবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, “বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।” পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন, “আমি যাঁহার অতিথি তাঁহার মত করিতে পারিলে, আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তুত।” উকিলটিকে বিশেষ বুঝাইয়া, স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় আসিলাম। সঙ্গে মাত্র একটি কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক। স্বামিজী তখন ফ্রান্স দেশের

সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাসায় আসিয়া দশটার সময় চা খাওয়া হইল; তাহার পরেই আবার এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলও চাহিয়া খাইলেন। আমার নিজের মনে যে সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল সে সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহসা ভরসা হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া, তিনি নিজেই আমার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দুই কথাতেই বুঝিয়া লইলেন।

ইতিপূর্ব্বে টাইমস্ সংবাদপত্রে একজন, একটি সুন্দর কবিতায় ঈশ্বর কি, কোন্ ধর্ম্ম সত্য,—প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছিলেন ; সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত ঠিক মিল হওয়ায়, আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, "লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।" আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। খৃষ্টান মিশনরীদের সহিত—'ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান্, এককালে দুই-ই হইতে পারেন না'—এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই ; মনে করিলাম, এ সমস্যাপূরণ স্বামিজীও করিতে পারিবেন না। স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তুমি ত Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্রত্যেক জড় পদার্থে দুইটি opposite forces centripetal and

centrifugal কি act করে না? যদি দুইটি opposite forces জড় বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় opposite হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভবে না? All I can say is that you have a very poor idea of your God। আমি ত নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, Truth is absolute। সমস্ত ধর্ম্ম কখন এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব সে সকলই আপেক্ষিক সত্য বা Relative truths—Absolute truthএর ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির অসম্ভব। অতএব সত্য Absolute হইলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি নিত্য (Absolute) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকলগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে Photograph লইলে একই সূর্য্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয়—প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যের—তদ্রূপ। আপেক্ষিক সত্য (Relative truth) সকল, নিত্য সত্যের

(Absolute truth) সম্বন্ধে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্ম্মই সেই জন্য সেই নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।

বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল বলায় স্বামিজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "রাজা হইলে আর খাওয়া পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন; বিশ্বাস কি কখন জোর করিয়া হয়! অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।" কোন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে "সাধু" বলায় তিনি উত্তর করিলেন, "আমরা কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শ মাত্রেই দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়।"

"সন্ন্যাসীরা এরূপ অলস হইয়া কেন কালক্ষেপ করেন? অপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন—সমাজের হিতকর কোন কাজকর্ম্ম কেন করেন না"—প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্বামিজী বলিলেন, "আচ্ছা বল দেখি—তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ। তাহার যৎসামান্য অংশ কেবল নিজের জন্য খরচ করিতেছ; বাকি কতক অন্য কতকগুলি লোককে আপনার ভেবে তাহাদের জন্য খরচ করিতেছ। তাহারা তজ্জন্য না তোমার কৃত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে সন্তুষ্ট। বাকি যকের মত প্রাণপণে

জমাইতেছ; তুমি মরিয়া গেলে অন্য কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয় ত—আরো টাকা রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই ত গেল তোমার হাল। আর আমি, ওসব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, হাত মুখে তুলিয়া দেখাই; যাহা পাই, তাহা খাই; কিছুই কষ্ট করি না; কিছু সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান?—তুমি কি আমি?" আমি ত শুনিয়া অবাক্, ইহার পূর্ব্বে আমার সম্মুখে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে ত কাহারও সাহস দেখি নাই।

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর, পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির বাসায় যাওয়া হইল ও তথায় অনেক বাদানুবাদ ও কথোপকথন চলিল। রাত্রি নয়টার সময় স্বামিজীকে লইয়া পুনরায় আমার বাসায় ফিরিলাম। আসিতে আসিতে বলিলাম, "স্বামিজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন "বাবা, তোমরা যেরূপ Utilitarian যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেন, যে

সকল লোক সভায় তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন. জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বল্‌লে ও তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা স্বামিজী, সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিরূপে ?"

তিনি বলিলেন, "ঐ সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন ; কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করেছে, আর তাহার কতবার উত্তর দিয়াছি।" রাত্রে আহার করিতে বসিয়া আবার কত কথা কহিলেন। পয়সা না ছুঁইয়া দেশ ভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা হইয়াছিল সে সব বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল—আহা! ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত না জানি সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু তিনি—সে সব যেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্কা খাইয়া এমন পেট জ্বালা যে, এক বাটী তেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও—এখানে সাধু সন্ন্যাসী জায়গা পায় না—এই বলিয়া অপরের তাড়না,

বা গুপ্ত পুলিশের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সেই সব ঘটনা তাঁহার পক্ষে যেন তামাসা মাত্র।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহার বিছানা করিয়া দিয়া, আমিও ঘুমাইতে গেলাম; কিন্তু সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। ভাবিতে লাগিলাম, এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামিজীকে দেখিয়া ও তাঁহার দুই চার কথা শুনিয়াই সমস্ত দূর হইল! আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল আমাদের কেন—আমাদের চাকর-বাকরেরও তাঁহার প্রতি এত ভক্তি শ্রদ্ধা হইল যে, তাহাদের সেবায় ও আগ্রহে স্বামিজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হইত।

২০শে অক্টোবর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। সকালে উঠিয়া স্বামিজীকে নমস্কার করিলাম। এখন সাহস বাড়িয়াছে, ভক্তিও হইয়াছে। স্বামিজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সহরে আজ তাঁহার চার দিন বাস হইল। পঞ্চম দিনে তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের বেশী ও গ্রামে এক দিনের বেশী থাকিতে নাই। আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।" কিন্তু আমি ওকথা কোন মতেই শুনিব না, উহা তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই।

পরে অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, “এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে মায়া মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়াছি, সেইরূপ মায়ায় মুগ্ধ হইবার যত উপায় আছে তাহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।”

আমি বলিলাম যে, তিনি কখনও মুগ্ধ হইবার নন। পরিশেষে আমার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও দুই চারি দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে আমার মনে হইল স্বামিজী যদি সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার লেক্চার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয়। অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু লেক্চার দিলে, হয় ত নাম-যশের ইচ্ছা হইবে এই বলিয়া তিনি কোন মতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সভায় প্রশ্নের উত্তর দান (Conversational meeting) করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, এ কথা জানাইলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী Pickwick Papers হইতে দুই তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। আমি উহা অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম—পুস্তকের কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া আমার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হইয়া

সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ করিলেন? পূর্ব্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "দুইবার পড়িয়াছি। একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ ছয় মাস হইল আর একবার।"

অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কেমন করিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?"

স্বামিজী বলিলেন, "একান্ত মনে পড়া চাই; আর খাদ্যের সার ভাগ হইতে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করিয়া পুনরায় উহা assimilate করা চাই।"

আর একদিন স্বামিজী মধ্যাহ্নে একাকী বিছানায় শুইয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন। আমি অন্য ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন যে, আমি, এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে ভাবিয়া তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বিশেষ কিছুই হয় নাই। তিনি যেমন বই পড়িতেছিলেন, তেমনি পড়িতেছেন। প্রায় ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন না। বই ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁহার মন নাই। পরে আমাকে দেখিয়া, ভিতরে আসিতে বলিলেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি শুনিয়া

বলিলেন, "যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা এক-মনে, একপ্রাণে, সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পওহারী বাবা ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটীটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মত দেখাইত।"

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামিজী, চুরি করা পাপ কেন? সকল ধর্ম্মে চুরি করিতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের, উহা অপরের ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনা মাত্র। কৈ, আমায় না জানাইয়া, আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ আমার কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে ত উহা চুরি করা হয় না? তাহার পর পশু পক্ষী আদি আমাদের কোন জিনিষ নষ্ট করিলে তাহাকেও ত চুরি বলি না?"

স্বামিজী বলিলেন, "অবশ্য, সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে মন্দ এবং পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এমন কোন জিনিষ বা কার্য্য নাই। আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক জিনিষ মন্দ এবং প্রত্যেক কার্য্যই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে যাহাতে অপর কাহারও কোন প্রকার কষ্ট উপ-স্থিত হয় এবং যাহা করিলে, শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার দুর্ব্বলতা আসে, সে কর্ম্ম

করিবে না; উহাই পাপ, আর তদ্বিপরীত কর্ম্মই পুণ্য। মনে কর, তোমার কোন জিনিষ কেহ চুরি করিলে তোমার দুঃখ হয় কি-না? তোমার যেমন, সমস্ত জগতেরও তেমনি জানিবে। এই দুই দিনের জগতে সামান্য কিছুর জন্য যদি তুমি এক প্রাণীকে দুঃখ দিতে পার, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তুমি কী মন্দ কর্ম্ম না করিতে পারিবে? আবার পাপ পুণ্য না থাকিলে সমাজ চলে না। সমাজে থাকিতে হইলে তাহার নিয়মাদি পালন করা চাই। বনে গিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচ, ক্ষতি নাই—কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না; কিন্তু সহরে করিলে পুলিশের দ্বারা ধরাইয়া তোমায় কোন নির্জ্জন স্থানে বন্ধ করিয়া রাখাই উচিত।"

স্বামিজী অনেক সময় ঠাট্টা বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাষ্টারের কাছে বসার মত ছিল না। খুব রঙ্গ রস চলিতেছে; বালকের মত হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন; আবার তখনই এমনি গম্ভীর ভাবে জটিল প্রশ্ন সমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক্ হইয়া ভাবিত,—ইঁহার ভিতর এত শক্তি! এই ত দেখিতেছিলাম, আমাদের মতনই এক-

জন! সকল সময়েই তাঁহার নিকট লোকে শিক্ষা লইতে আসিত। সকল সময়েই তাঁহার অবারিত দ্বার ছিল। তাহার ভিতর নানা লোকে নানা ভাবেও আসিত, —কেহ বা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহ বা খোসগল্প শুনিতে, কেহ বা তাঁহার নিকট আসিলে অনেক ধনী বড়লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে বলিয়া, আবার কেহ বা সংসার-তাপে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার নিকট দুই দণ্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিবে বলিয়া। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আসুক না কেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন এবং তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারও এড়াইবার বা কিছু গোপন করিবার সাধ্য ছিল না! এক সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র সন্তান ইউনিভার্সিটীর পরীক্ষার হস্ত এড়াইবে বলিয়া স্বামিজীর নিকট ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং সাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। সে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশী বেশী আসে? উহাকে কি সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দেবেন? উহার বাপ আমার একজন বন্ধু।"

স্বামিজী বলিলেন, "উহার পরীক্ষা কাছে, পরীক্ষা দিবার ভয়ে সাধু হইবার ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি, এম্, এ, পাশ করিয়া সাধু হইতে আসিও; বরং এম্, এ, পাশ করা সহজ কিন্তু সাধু হওয়া তদপেক্ষা কঠিন।"

স্বামিজী আমার বাসায় যতদিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কথোপকথন শুনিতে যেন সভা বসিয়া যাইত, এতই অধিক লোকসমাগম হইত। ঐ সময় এক দিন আমার বাসায় একটি চন্দন গাছের তলায় তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, জন্মেও তাহা ভুলিতে পারিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলিতে হইবে। সেই-জন্য উহা অন্য সময়ের জন্য রাখাই যুক্তিযুক্ত। এস্থলে নিজের কথা আর একটু বলিব। কিছু পূর্ব্ব হইতে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, গুরুর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, "এমন লোককে গুরু করিও, যাঁহাকে আমিও ভক্তি করিতে পারি। গুরু বাড়ী ঢুকিলেই যদি আমার ভাবান্তর হয়, তাহা হইলে তোমার কিছুই আনন্দ বা উপকার হইবে না। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহা হইলে উভয়ে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে।" সেও তাহাতে স্বীকার পায়। স্বামিজীর

আগমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্যা হইতে ইচ্ছা কর কি ?"

সেও আগ্রহে বলিল, "উনি কি গুরু হইবেন ? হইলে ত আমরা কৃতার্থ হই।"

স্বামিজীকে একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামিজী, আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন ?" স্বামিজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে আমাদের উভয়কে দীক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম।

তিনি বলিলেন, "গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল। গুরু হওয়া বড় কঠিন। শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষার পূর্ব্বে গুরুর সহিত শিষ্যের অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক" প্রভৃতি নানা কথা কহিয়া আমায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিলেন, আমি কোন প্রকারে ছাড়িবার নহে, তখন অগত্যা স্বীকার করিলেন ও (২৫ অক্টোবর, ১৮৯২ সালে) আমাদের দীক্ষা প্রদান করিলেন। এখন আমার ভারি ইচ্ছা হইল, স্বামিজীর ফটো তুলিয়া লই। তিনি সহজে স্বীকৃত হইলেন না। পরে অনেক বাদানুবাদের পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ২৮শে তারিখে ফটো তোলাইতে সম্মত হইলেন ও ফটো লওয়া হইল। ইতি-

পূর্ব্বে তিনি একজনের আগ্রহ সত্ত্বেও ফটো তুলিতে দেন নাই বলিয়া আমাকে দুই কপি ফটো তাহাকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমিও সে কথা সানন্দে স্বীকার করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামিজী বলিলেন, "তোমার সহিত জঙ্গলে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু, চিকাগোয় ধর্ম্ম-সভা হইবে, যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় ত তথায় যাইব।" আমি চাঁদার লিষ্ট করিয়া টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করায়, তিনি কি ভাবিয়া স্বীকার করিলেন না। এই সময় স্বামিজীর ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করিবেন না। আমি অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহার মারহাট্টি জুতার পরিবর্ত্তে এক জোড়া জুতা ও এক গাছি বেতের ছড়ি দিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে কোলা-পুরের রাণী অনেক অনুরোধ করিয়াও স্বামিজীকে কিছুই গ্রহণ করাইতে না পারিয়া, অবশেষে দুইখানি গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। স্বামিজীও তাহা গ্রহণ করিয়া যে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা সেইখানেই ত্যাগ করেন এবং বলেন, "সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।"

ইতিপূর্ব্বে আমি ভগবদ্‌গীতা অনেক বার পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে না পারায় পরিশেষে

উহাতে বুঝিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া, ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামিজী গীতা লইয়া আমাদিগকে একদিন বুঝাইতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহা কি অদ্ভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে Jules Verne এর Scientific novels এবং Carlyle এর Sartor Resartus পড়িতে তাঁহার নিকটে শিখি।

তখন স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধাদি অনেক ব্যবহার করিতাম। সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন তিনি বলিলেন, "যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে যে, শয্যাশায়ী করিয়াছে, আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাইবে, নতুবা নহে। Nervous debility প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐ সকল রোগের হাত হইতে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চাইতে বেশী লোককে মারেন। আর ওরূপ সর্ব্বদা রোগ রোগ করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন বাঁচ আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ আসিয়াছে, তাহা আর করিও না। তোমার আমার মত একটা মরিলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে না, বা জগতের কোন বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত

হইবে না।" এই সময়ে আবার অনেক কারণ বশতঃ, উপরিস্থ কর্ম্মচারী সাহেবদের সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাঁহারা সামান্য কিছু বলিলে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিত, এবং এমন ভাল চাকুরি পাইয়াও একদিনের জন্যও সুখী হই নাই। তাঁহাকে এ সমস্ত কথা বলায় তিনি বলিলেন, "কিসের জন্য চাকুরি করিতেছ? বেতনের জন্য ত? বেতন ত মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন মনে কষ্ট পাও? আর ইচ্ছা হইলে যখন চাকুরি ছাড়িয়া দিতে পার, কেহ বাঁধিয়া রাখে নাই, তখন 'বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি' ভাবিয়া দুঃখের সংসারে আরও দুঃখ বাড়াও কেন? আর এক কথা, বল দেখি, যাহার জন্য বেতন পাইতেছ, আফিসের সেই কাজগুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া, তোমার উপরওয়ালা সাহেবদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য কখনও কিছু করিয়াছ কি? কখনও সেজন্য চেষ্টা কর নাই, অথচ তাহারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে বলিয়া তাহাদের উপর বিরক্ত! ইহা কি বুদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমরা অন্যের উপর হৃদয়ের যে ভাব রাখি, তাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ না করিলেও তাহাদের ভিতরে আমাদের উপর, ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিতরকার ছবিই আমরা জগতে প্রকাশ

রহিয়াছে দেখি। 'আপ্ ভাল তো জগৎ ভাল' একথা যে কত দূর সত্য কেহই জানে না। আজ হইতে মন্দটি দেখা, একেবারে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা কর। দেখিবে, যে পরিমাণে তুমি উহা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের ভিতরের ভাব এবং কার্য্যও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।" বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে আমার ঔষধ খাইবার বাতিক দূর হইল এবং অপরের উপর দোষদৃষ্টি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের একটা নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল।

স্বামিজীর নিকট একবার, ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি—এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ায় তিনি বলিলেন, "যাহা অভীষ্ট কার্য্যের সাধনভূত তাহাই ভাল; আর যাহা তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ। ভাল-মন্দের বিচার, আমরা জায়গা উঁচু-নিচু-বিচারের ন্যায় করিয়া থাকি। যত উপরে উঠিবে তত দুই, এক হয়ে যাবে। চন্দ্রেতে পাহাড় ও সমতল আছে—বলে; কিন্তু আমরা সব এক দেখি—সেইরূপ।" স্বামীজির এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল, যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে, মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত।

আর একদিনের কথা—কলিকাতায় একটি লোক অনাহারে মারা গিয়াছে, খবরের কাগজে এই কথা পড়িয়া স্বামিজী এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, তাহা বলিবার নহে। বার বার বলিতে লাগিলেন, "এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়!" কেন—জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "দেখিতেছ না, অন্যান্য দেশে কত poor-house, work-house, charity fund প্রভৃতি সত্বেও শত শত লোক প্রতি-বৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টিভিক্ষার পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক মরিতে কখন শোনা যায় নাই। আমি এই প্রথম কাগজে এ কথা পড়িলাম যে, দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে কলিকাতায় অনাহারে লোক মরে।"

ইংরাজী শিক্ষার কৃপায় আমি দুই চারি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। মনে হইত, ঐরূপে যৎসামান্য যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না; বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া, তাহা মদ গাঁজায় খরচ করিয়া তাহারা আরো অধঃপাতে যায়। লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়। সে জন্য আমার মনে হইত, লোককে কিছু কিছু দেওয়া

অপেক্ষা একজনকে বেশী দেওয়া ভাল। স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ভিখারী আসিলে যদি শক্তি থাকে তো যাহা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দুই একটি পয়সা; তজ্জন্য সে কিসে খরচ করিবে, সদ্ব্যয় হইবে কি অপব্যয় হইবে, এসব লইয়া এত মাথা ঘামাইবার দরকার কি? আর সত্যই যদি সেই পয়সা গাঁজা খাইয়া উড়ায়, তাহা হইলেও তাহাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ বৈ লোক্‌সান নাই। কেন না, তোমার মত লোকেরা তাহাকে দয়া করিয়া কিছু কিছু না দিলে, সে উহা তোমাদেরই নিকট হইতে চুরি করিয়া লইবে। তাহা অপেক্ষা দুইপয়সা ভিক্ষা করিয়া গাঁজা টানিয়া, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা কি তোমাদেরই ভাল নহে? অতএব ঐ প্রকার দানেও সমাজের উপকার বৈ অপকার নাই।"

প্রথম হইতেই স্বামিজীকে বাল্য বিবাহের উপর ভারি চটা দেখিয়াছি। সর্ব্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী ও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখি নাই! পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিবার পর যাঁহারা স্বামিজীর প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন না,

তথায় যাইবার পূর্ব্বে তিনি সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন করিয়া, কাঞ্চন মাত্র স্পর্শ না করিয়া কত কাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মত শক্তিমান পুরুষের এত বাঁধা-বাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই—কোন লোক একবার এই কথা বলায় তিনি বলেন, "দেখ, মন বেটা বড় পাগল, ঘোর মাতাল, চুপ করে কখনই থাকে না; একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেই জন্য সকলেরই বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চলিতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁহাদের খুব দখল আছে। তবে ইচ্ছা করিয়া কখন একটু আল্‌গা দেন মাত্র। কিন্তু কাহার কতটা দখল হইয়াছে, তাহা একবার ধ্যান করিতে বসিলেই টের পাওয়া যায়। এক বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। সকলেই মনে করেন, তাঁহারা স্ত্রৈণ নন, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেন মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখন নিশ্চিন্ত থাকিও না।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিলাম, "স্বামিজী

দেখিতেছি, ধৰ্ম্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখা পড়া জানা আবশ্যক।”

তিনি বলিলেন, “নিজে ধৰ্ম্ম বুঝিবার জন্য লেখাপড়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, ‘রামকেষ্ট’ বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধৰ্ম্মের সার তত্ত্ব তাঁহা অপেক্ষা কে বুঝিয়াছিল?”

আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু সন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদা সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলায় তিনিও বিদ্রূপ-ছলে উত্তর করিলেন, “ইহাই আমার Famine insurance fund; যদি পাঁচ সাত দিন খাইতে না পাই, তবু আমার চৰ্ব্বি আমাকে জীবিত রাখিবে। তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধৰ্ম্মে মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধৰ্ম্ম নহে, dyspepsia প্রসূত রোগ বিশেষ বলিয়া জানিও।” স্বামিজী সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন একটি গান আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ‘ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস’; তার পর শুনিবার আমার অবসরই বা কোথায়? তাঁহার কথা ও গল্পই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্ম্ম-বিষয়ক মীমাংসা সকল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের একই লক্ষ্য, একই দিকে গতি, দেখাইতে তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতা আর কাহারও দেখা যায় নাই।

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন, "পর্য্যটন-কালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানা প্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ নিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেই জন্য এত লঙ্কা খাই।"

রাজোয়ারা ও ক্ষেত্ড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি, ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা-রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন; তাঁহাদেরও তিনি অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। অসামান্য ত্যাগী হইয়া, রাজা-রাজড়ার সহিত অত মেশামিশি তিনি কেন করেন, একথা

অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইত না। কোন কোন নির্ব্বোধ লোক এজন্য তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেন, "হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়া ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে লওয়াইয়া যে ফল হইবে, একজন শ্রীমান্ রাজাকে সেই দিকে লওয়াইতে পারিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে, ভাব দেখি। গরিব প্রজার ইচ্ছা হইলেও সৎকার্য্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গল বিধানের ক্ষমতা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে তাহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধীনস্থ সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশী কল্যাণ হইবে।"

বাগ্‌বিতণ্ডায় ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম অনুভব প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন, "Test of pudding lies in eating, অনুভব কর; তাহা না হইলে কিছুই বুঝিবে না।" তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলিতেন, "ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল; নতুবা নবানুরাগটুকু

কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।”

আমি বলিলাম, “কিন্তু ঘরে থাকিয়া সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন ; আপনি, সর্ব্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগ দ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে সকল কাজ ধর্ম্মলাভের প্রধান সহায় বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে না।

উত্তরে তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলিয়া বলিলেন, “কখন ফোঁস ছেড়ো না, আর কর্ত্তব্য পালন করিতেছ মনে করিয়া সকল কর্ম্ম করিও। কেহ দোষ করে, দণ্ড দিবে, কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়া কখন রাগ করিও না।” পরে পূর্ব্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেন, “এক সময়ে আমি এক তীর্থ স্থানের পুলিশ ইন্‌স্পেক্‌টরের অতিথি হইয়াছিলাম ; লোকটির বেশ ধর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫৲ টাকা, কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার বাসার খরচ মাসে দুই তিন শত টাকা হইবে। যখন বেশী জানাশুনা হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ত আয় অপেক্ষা খরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কিরূপে ?' তিনি ঈষৎ

হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আপনারাই চালান। এই তীর্থ স্থলে যে সকল সাধু সন্ন্যাসী আসেন, তাঁহাদের ভিতর সকলেই কিছু আপনার মত নন্। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের নিকট কি আছে না আছে, তল্লাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট প্রচুর টাকা কড়ি বাহির হয়। যাহাদিগকে চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকা কড়ি ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুসঘাস কিছু লইনা।'

স্বামিজীর সহিত, একদিন অনন্ত (Infinity) পদার্থ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হয়। সেই কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য; তিনি বলিলেন, "There can be no two infinities." আমি, সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলেন, আকাশ অনন্তটা বুঝিলাম কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত, এ কথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিষ অনন্ত হইলে কোন্‌টা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখবে, সময়ও যাহা আকাশও তাহাই; আরো অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থ ই অনন্ত, ও সেই সকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুইটা দশটা নয়।"

এইরূপে স্বামিজীর পদার্পণে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত

আমার বাসায় আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল। ২৭ তারিখে বলিলেন, "আর থাকিব না; রামেশ্বর যাইব মনে করিয়া অনেক দিন হইল এই দিকে চলিতেছি। যদি এই ভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এ জনমে আর রামেশ্বর পৌঁছান হইবে না।" আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর রাখিতে পারিলাম না। ২৭শে অক্টোবর মেল ট্রেনে, তিনি মরমাগোয়া যাত্রা করি-বেন, স্থির হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না! টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, "স্বামিজী, জীবনে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

* * * *

স্বামিজীর সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। প্রথম আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে। সেবারকার দেখার কথা অনেকটা আপনাদের বলিয়াছি। বেলগাঁ বা বেলগ্রামে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। দ্বিতীয়, যখন তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত এবং আমেরিকা যাত্রা করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে। তৃতীয় এবং শেষবার দেখা হয়, তাঁহার দেহত্যাগের ছয় সাত মাস

পূর্ব্বে। এই কয়বারে তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। অনেক কথা আমার নিজের সম্বন্ধে বলিয়া বলিবার নহে; আবার অনেক কথা ভুলিয়াও গিয়াছি। যাহা মনে আছে, তাহার ভিতর সাধারণ-পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি জানাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি হিন্দুদিগের জাতি-বিচার সম্বন্ধে ও কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া যে বক্তৃতাগুলি মাদ্রাজে করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বামিজীর ভাষাটা একটু বেশি কড়া হইয়াছে। তাঁহার নিকট সে কথা প্রকাশও করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্ত সত্য। আর যাঁহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহাদের কার্য্যের তুলনায় উহা বিন্দুমাত্রও অধিক কড়া নহে। সত্য কথার সঙ্কোচ বা গোপন করার তো কোন কারণ দেখি না; তবে ঐরূপ কার্য্যের ঐরূপ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে করিও না যে, তাঁহাদের উপর আমার রাগ ছিল বা আছে অথবা কেহ কেহ যেমন ভাবিয়া থাকেন, কর্ত্তব্যবোধে যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমি দুঃখিত।

ও কথার একটাও সত্য নহে। আমি রাগিয়াও ঐ কাজ করি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও দুঃখিত নহি। এখনও যদি ঐরূপ কোন অপ্রিয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এখনও ঐরূপ নিঃসঙ্কোচে উহা নিশ্চয় করি।”

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার মতামত পূর্ব্ববারে কিছু বলিয়াছি। আর একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উঠায় বলিলেন, “অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক ওয়ারেণ্টের ভয়ে কিংবা উৎকট দুষ্কর্ম্ম করিয়া লুকাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে বেড়ায় সত্য; কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মত ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই। সে পেট ভরিয়া ভাল খাইলে দোষ, বিছানায় শুইলে দোষ, এমন কি, জুতা বা ছাতি পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার করার যো নাই। কেন, তারাও তো মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হইলে তাহার আর গেরুয়া বস্ত্র পরিবার অধিকার নাই—ইহা ভুল। এক সময়ে আমার একটি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোষাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।”

স্বামিজী বলিতেন, "দেশ, কাল, পাত্র ভেদে মানসিকভাব ও অনুভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রত্যেক মানুষেরই আবার একটা-না-একটা বিষয়ে বেশি ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে সকলেই আপনাকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমিই কেবল বুঝি, অন্যে বুঝে না, ইহাতেই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সকলেই চায়, প্রত্যেক বিষয়টা অপর সকলে তাহারই মত দেখুক ও বুঝুক। সে যেটা সত্য বুঝিয়াছে বা যাহা জানিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কোন সত্য থাকিতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হউক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই হউক, ওরূপ ভাব কোন মতে মনে আসিতে দেওয়া উচিত নয়।

জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে নীতি এবং সৌন্দর্য্য-বোধও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বত দেশে এক স্ত্রীলোকের বহু পতি থাকা প্রথা প্রচলিত আছে। হিমালয় ভ্রমণ কালে আমার ঐরূপ একটি তিব্বতীয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পরিবারে ছয়জন পুরুষ এবং ঐ ছয়জনের একমাত্র স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঢ়তা জন্মিলে আমি একদিন তাহাদের ঐ

কুপ্রথা সম্বন্ধে বলায় তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইয়া লোককে স্বার্থপরতা শিখাইতে চাহিতেছ? 'এটি আমারই উপভোগ্য, অন্যের নয় এরূপ ভাব কি অন্যায় নহে?' " আমি ত শুনিয়া অবাক।

"নাসিকা এবং পায়ের খর্ব্বতা লইয়াই চীনের সৌন্দর্য্য-বিচার, এ কথা সকলেরই জানা আছে। আহারাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইংরাজ আমাদের মত সুবাসিত চাউলের অন্ন ভাল বাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের জজসাহেবের অন্যত্র বদলি হওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল মোক্তার, তাঁহার সন্মানার্থ উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েক সের সুবাসিত চাউল ছিল। জজসাহেব সুবাসিত চাউলের ভাত খাইয়া উহা পচা চাউল মনে করেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, You ought not to have given me rotten rice. (তোমাদের পচা চাউলগুলো আমাকে উপঢৌকন দেওয়া ভাল হয় নাই।)

"কোন এক সময়ে ট্রেনে যাইতেছিলাম; সেই কামরায় চার পাঁচটি সাহেব ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, 'সুবাসিত গুড়ুক তামাক জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করাই তামাকু সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ।' আমার নিকট খুব ভাল তামাক ছিল,

তাঁহাদিগকে উহা দেখিতেও দিলাম। তাঁহারা আঘ্রাণ লইয়াই বলিলেন, 'এ ত অতি দুর্গন্ধ! ইহাকে তুমি সুগন্ধ বল?' এইরূপে গন্ধ, আস্বাদ, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমাজ, দেশ, কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।"

স্বামিজীর পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। আমার মনে হইল, পূর্ব্বে শিকার করা আমার কত প্রিয় ছিল। কোন পশু পক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে মারিব, এই জন্য প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ করিত। মারিতে না পারিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এখন ওরূপে প্রাণিবধ একেবারেই ভাল লাগে না। সুতরাং কোন জিনিষটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগা কেবল অভ্যাসের কাজ।

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জিদ দেখা যায়। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামিজী ঐ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেন। এক সময়ে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিবার জন্য অন্য এক রাজা সদলবলে উপস্থিত হইলেন। কাজেই, শত্রুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় স্থির করিবার জন্য সেই রাজ্যে এক মহা সভা আহূত হইল। সভায় ইঞ্জিনীয়ার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, কর্ম্মকার, উকিল, পুরোহিত প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ উপস্থিত হইলেন।

ইঞ্জিনীয়ার বলিলেন, 'সহরের চারিদিকে বেড়া দিয়া এক বৃহৎ খাল খনন কর।' সূত্রধর বলিল, 'কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাক্।' চামার বলিল, 'চামড়ার মত মজবুত কিছুই নাই; চামড়ার বেড়া দাও।' কামার বলিল, 'ও সব কাজের কথা নয়; লোহার দেওয়ালই ভাল; ভেদ করিয়া গুলিগোলা আসতে পারবে না।' উকিল বলিলেন,—কিছুই করিবার দরকার নাই; 'আমাদের রাজ্য লইবার শত্রুদের কোন অধিকার নাই,—এই কথাটি, তাহাদের তর্ক যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাউক।' পুরোহিত বলিলেন, 'তোমরা সকলেই বাতুলের মত প্রলাপ বকিতেছ। হোম যাগ কর, স্বস্ত্যয়ন কর, তুলসী দাও, শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না।' এই-রূপে রাজ্য বাঁচাইবার কোন উপায় স্থির না করিয়া তাহারা নিজ নিজ মত লইয়া মহা হুলস্থূল তর্ক আরম্ভ করিল। এই রকম করাই মানুষের স্বভাব!

গল্পটি শুনিয়া আমারও মানুষের মনের একঘেয়ে ঝোঁকসম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িল। স্বামিজীকে বলিলাম, "স্বামিজী, আমি ছেলেবেলায় পাগলের সহিত আলাপ করিতে ভারি ভাল বাসিতাম। একদিন একটি পাগল দেখিলাম, বেশ বুদ্ধিমান; ইংরাজীও একটু আধটু জানে; তার চাই কেবল জল খাওয়া!

সঙ্গে একটি ভাঙ্গা ঘটী। যেখানে জল পায়, খাল হউক, হোউজ হউক, নূতন একটা জলের জায়গা দেখিলেই সেখানকার জল পান করিত! আমি তাহাকে এত জল খাবার কারণ জিজ্ঞাসায় সে বলিল, 'Nothing like water' sir!' (জলের মত কোন জিনিষই নাই, মোশাই!) তাহাকে আমি একটি ভাল ঘটী দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, সে উহা কোন মতে লইল না। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, 'এটি ভাঙ্গা ঘটী বলিয়াই এতদিন আছে। ভাল হইলে অন্যে চুরি করিয়া লইত'।"

স্বামিজী গল্প শুনিয়া বলিলেন, "সেত বেশ মজার পাগল! ওদের Monomaniac বলে। আমাদের সকলেরই ঐ রকম এক একটা ঝোঁক আছে। আমাদের উহা চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে। পাগলের তাহা নাই। পাগলের সহিত আমাদের এইটুকু মাত্র প্রভেদ। রোগে, শোকে, অহঙ্কারে, কামে, ক্রোধে, হিংসায় বা অন্য কোন অত্যাচার বা অনাচারে মানুষ দুর্ব্বল হইয়া ঐ সংযমটুকু হারালেই মুস্কিল! মনের আবেগ আর চাপিতে পারে না। আমরা তখনি বলি, ও ব্যাটা খেপেছে। এই আর কি!"

স্বামিজীর স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল; এ

কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপনাপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্য কর্ত্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া, সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তরে স্বামিজী যে জ্বলন্ত কথাগুলি বলেন, তাহা কখন জন্মেও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, "যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?" আমাদের প্রচলিত ধর্ম্মে, আচার ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায় যে অনেক দোষ আছে, স্বামিজী এ কথা স্বীকার করিতেন। বলিতেন, "সে সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে সকল ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ্ বাহিরে যে দেখায়, তাহার মত গর্দ্দভ আর কে আছে? Dirty linen must not be exposed in the street." (ময়লা কাপড় চোপড় রাস্তার ধারে, লোকের চোখের সাম্‌নে রাখাটা উচিত নয়।)

খৃষ্টান মিশনরীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্ত্তা হয়। তাঁহারা আমাদের দেশে, কত উপকার করেছেন

ও কর্‌ছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু অপকারও বড় কম করেন নাই। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোল্লায় দেবার বিলক্ষণ যোগাড় করেছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও নাশ হয়। এ কথা কেউ কি বোঝে? আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্ম্মের কুৎসা না করিয়া কিন্তু তাঁহাদের নিজের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায় না? আর এক কথা, যিনি যে ধর্ম্মমত প্রচার করিতে চান, তাঁর তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কাজ করা চাই। অধিকাংশ মিশনরী মুখে এক, কাজে আর। আমি কপটতার উপর ভারি চটা।"

একদিন ধর্ম্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি সুন্দর ভাবে বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম যত দূর মনে আছে, এইখানে লিখিলাম,—

"সকল প্রাণীই সতত সুখী হইবার চেষ্টায় বিব্রত। কিন্তু খুব কম লোকেই সুখী। কাজ কর্ম্মও সকলে অনবরত করিতেছে; কিন্তু তাহার অভিলষিত ফল পাওয়া প্রায় দেখা যায় না। এরূপ বিপরীত ফল উপস্থিত হইবার কারণ কি, তাহাও সকলে বুঝিবার চেষ্টা করে না। সেই জন্যই মানুষ দুঃখ পায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হউক না কেন, কেহ যদি ঐ

বিশ্বাস-বলে আপনাকে যথার্থ সুখী বলিয়া অনুভব করে, তাহা হইলে তাহার ঐ মত পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে; এবং করিলেও তাহাতে সুফল ফলে না। তবে, মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, যখন দেখিবে, কাহারও ধর্ম্মসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনিবারই কেবল মাত্র আগ্রহ আছে উহার কোন কিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা নাই তখনই জানিবে যে, তাহার কোন একটা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই।

"ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। কিন্তু পরজন্মে সুখী হইব বলিয়া ইহজন্মে দুঃখ ভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই জন্মে, এই মুহূর্ত্ত হইতেই সুখী হইতে হইবে। যে ধর্ম্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য্য। শিশু, অজ্ঞানী ও পশু-প্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এরূপ লোক দেখা যায় নাই। সচরাচর ইহাই দেখা যায়, যে, যাহারা ইন্দ্রিয়-

চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান্, বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করিয়া দ্বেষ করিয়া থাকে এবং তাহাদের বহুব্যয়সাধ্য উচ্চশ্রেণীর ইন্দ্রিয়ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া অসুখী হইয়া থাকে। সম্রাট্ আলেক-জেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, পৃথিবীতে আর জয় করিবার দেশ নাই ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য বুদ্ধিমান্ মনীষীরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া ভোগ বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্ম্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে।

"বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেই জন্য তাহাদের উপযোগী ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সন্তোষপ্রদ হইবে না, কিছুতেই তাহারা উহার অনুষ্ঠান করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্ম্মমত, তাহাদের নিজেকেই ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া, বাছিয়া লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই! ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করে মাত্র।

"কর্ম্ম সম্বন্ধেও জানা আবশ্যক যে, কোন-না-কোন প্রকার কর্ম্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না এবং কেবল ভাল বা কেবল মন্দ, জগতে এরূপ কোন কর্ম্মই নাই। ভালটা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু মন্দ করিতেই হইবে। আর সেজন্য কর্ম্ম দ্বারা যেমন সুখ আসিবে, কিছু-না-কিছু দুঃখ এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসিবেই আসিবে, উহা অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখটুকু যদি না লইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিষয়-ভোগ-জনিত আপাত সুখ লাভের আশাটাও ছাড়িতে হইবে! অর্থাৎ স্বার্থ-সুখ অন্বেষণ না করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। উহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। গীতাতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে উহারই উপদেশ করিবার জন্য বলিতেছেন, 'কাজ কর, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্যই কাজ কর'।"

কোন বিষয়ের ইতিহাস যে কত দূর ঠিক ঠিক লেখা হয়, সে বিষয়ে বর্ত্তমান লেখকের বড়ই সন্দেহ। তাহার কারণ অনেক। গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কোন সহরে পদার্পণ হইতে সেই সহর ত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা যতদূর সম্ভব স্বচক্ষে দেখার এবং পরে তাহারই বিবরণ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সকলে

পাঠ করার, আমাদের মত চাকুরে লোকের অনেক সুবিধা। সচরাচর আমাদের দৃষ্ট ঘটনাবলির সহিত ঐ সকল বিবরণের এত বিভিন্নতা দেখা যায় যে, অবাক হইতে হয়। চারিদিন পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তাহাই যথাযথ লিপিবদ্ধ করা যদি এত কঠিন হয়, তাহা হইলে চারি শত, চারি সহস্র বা চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে ঘটনা হইয়াছে, তাহার ইতিহাস কত-দূর যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পারা যায়।

আর এক কথা, খৃষ্টান মিশনরীদের মধ্যে অনেকে বলেন,—তাঁহাদের বাইবেলের প্রত্যেক ঘটনাটি যে সালে, যে তারিখে, যে ঘণ্টায় এবং যে মিনিটে ঘটিয়াছিল, তাহা একেবারে ঘড়ি ধরিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু একদিকে Conflict between religion and science প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তকে বাইবেলের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদেরই দেশের এখনকার পণ্ডিতদের মতামত পাঠ করিয়া বাইবেলের ঐতিহাসিকত্ব একদিকে যেমন বেশ বুঝা যায়, সেইরূপ অন্যদিকে মিশনরীদলের দ্বারা অনুবাদিত হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের অপূর্ব্ব বিবরণ পাঠ করিয়া তাঁহাদের লিখিত ইতিহাসও যে কতদূর ঠিক হইবে, তাহাও বুঝিতে বাকি থাকে না! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মানবজাতির সত্যানুরাগ এবং ইতিহাসে

লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর হরিভক্তি প্রায় একেবারে উড়িয়া যায়।

গীতা, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থনিবদ্ধ ঘটনাবলীর যথাযথ ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সেই-জন্য আমার আদৌ বিশ্বাস হইত না। স্বামিজীকে এক-দিন জিজ্ঞাসা করি যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিপূর্বে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম উপদেশ, যাহা ভগবদ্গীতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কি-না? উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সুন্দর। তিনি বলিলেন, "গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখার বা পুস্তকাদি ছাপার এখনকার মত এত ধুমধাম ছিল না; সে জন্য তোমাদের মত লোকের কাছে ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু গীতোক্ত ঘটনা যথাযথ ঘটিয়াছিল কি-না, তজ্জন্য তোমাদের মাথা ঘামাইবার কারণও দেখিতেছি না। কেন না, যদি কেহ, শ্রীভগবান্ সারথি হইয়া অর্জ্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, ইহা অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে তোমাদের বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই কি তোমরা গীতাতে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস করিবে? সাক্ষাৎ ভগবান্ যখন তোমাদের নিকট মূর্ত্তিমান হইয়া আসিলেও

তোমরা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ছুট ও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে বল, তখন গীতা ঐতিহাসিক কি-না, এ বৃথা সমস্যা লইয়া কেন ঘুরিয়া বেড়াও? পার যদি তো গীতার উপদেশগুলি যতটা পার, জীবনে পরিণত করিয়া কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলিতেন, 'আম খা, গাছের পাতা গুণে কি হবে?' আমার বোধ হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর বিশ্বাস অবিশ্বাস করা is a matter of personal equation—অর্থাৎ মানুষ কোন এক অবস্থা বিশেষে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধার কামনায় পথ খুঁজিতে থাকে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনার সহিত তাহার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে পাইলে, ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস করে। আর ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ঐ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।"

স্বামিজী একদিন শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অভীষ্ট কার্য্যের নিমিত্ত সংরক্ষণ করা যে প্রত্যেকের কতদূর কর্ত্তব্য, তাহা অতি সুন্দর ভাবে আমাদের বুঝাইয়াছিলেন,—"অনধিকার চর্চ্চায় বা বৃথা কাজে যে শক্তি ক্ষয় করে, অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধির জন্য পর্য্যাপ্ত শক্তি সে আর কোথায় পাইবে? The sum-total of

the energy which can be exhibited by an ego is a constant quantity—অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করিবার যে শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা সসীম ; সুতরাং সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হইলে ততটা আর অন্যভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ধর্ম্মের গভীর সত্য সকল জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অনেক শক্তির প্রয়োজন ; সেই জন্যই ধর্ম্মপথের পথিকদিগের প্রতি বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তি ক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা শক্তি সংরক্ষার উপদেশ সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।”

স্বামিজী বাঙ্গালাদেশের পল্লিগ্রাম ও তথাকার লোকদের কতকগুলি আচরণের উপর বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পল্লিগ্রামের একই পুষ্করিণীতে স্নান, জলশৌচ প্রভৃতি এবং সেই পুকুরের জলই পান করা প্রথার উপর তিনি ভারি বিরক্ত ছিলেন। প্রায়ই বলিতেন, “যাহাদের মস্তিষ্ক মলমূত্রে পরিপূর্ণ, তাহাদের আশা ভরসা আর কোথায় ? আবার ঐ যে পাড়াগেঁয়ে লোকেদের অনধিকার চর্চ্চা করা, উহা অত্যন্ত খারাপ। সহরের লোকেরও যে, অনধিকার চর্চ্চা নাই, তাহা নহে। তবে তাহাদের সময় কম, কারণ, সহরে খরচ বেশী ; কাজেই খাটুনিও বেশী।

সে খাটুনি খেটে, বড়ে টেপা, তামাক খাওয়া ও পরনিন্দা করবার আর সময় থাকে না। নইলে সহুরে ভূতগুলো ঐ বিষয়ে পাড়াগেঁয়ে ভূতের ঘাড়ে চড়ে বেড়াত।”

স্বামিজীর এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্ত্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইত। একই প্রশ্নের বারবার একইভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝান তাঁহার রীতি ছিল না। যতবারই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই উহা নূতন ভাবে নূতন দৃষ্টান্ত সহায়ে এম্‌নি বলিবার ক্ষমতা ছিল যে, উহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া লোকের বোধ হইত এবং তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে ক্লান্তি বোধ দূরে থাকুক্, আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। বক্তৃতা করা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐ প্রথা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার বিষয়গুলি (points) লিখিয়া তিনি কোন কালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হাসি তামাসা, সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা এবং বক্তৃতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন বিষয় সকল লইয়াও চর্চ্চা করিতেন। বক্তৃতায় কি যে বলি-বেন, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। আমরা যে কয়েকটি দিন তাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়া ধন্য হইয়াছিলাম,

সেই কয়েকটি দিনের কথাবার্ত্তার বিবরণ আরও যত দূর পারি, ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

* * * *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে হিন্দু-ধর্ম্ম বুঝাইতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে স্বামিজীর মত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। তারই দুচারটি কথা আজ উপহার দিবার ইচ্ছা। কিন্তু বুঝিতে হইবে, আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহাই লিখিতেছি। অতএব যদি ইহাতে কোনরূপ ভুল থাকে, তাহা আমার বুঝিবার ভুল, স্বামিজীর ব্যাখ্যার নহে।

স্বামিজী বলিতেন,—"চেতন অচেতন, স্থূল, সূক্ষ্ম সবই, একত্বের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যত রকম রকম জিনিষ দেখিতে লাগিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিষ মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে বিচার করিয়া ঐ সমস্ত জিনিষগুলি ৬৩টা মূলদ্রব্য (Element) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল।

"ঐ মূল দ্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্র দ্রব্য (Compound) বলিয়া এখন অনেকের সন্দেহ হইতেছে। আর যখন রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছিবে, তখন সকল জিনিষই এক

জিনিষেরই অবস্থাভেদ মাত্র বোঝা যাইবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তাড়িত (Heat, light and electricity) বিভিন্ন জিনিষ বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলি চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। তার পর দেখিল যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে,—অন্য সকল চেতন প্রাণীর ন্যায়, গমন-শক্তি নাই মাত্র। তখন খালি দুইটি শ্রেণী রহিল,—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাইবে, আমরা যাহাকে অচেতন বলি, তাহাদেরও স্বল্পবিস্তর চৈতন্য আছে। *

"পৃথিবীতে যে উচ্চ, নিম্ন জমি দেখা যায়, তাহাও সতত সমতল হইয়া একভাবে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ষার জলে পর্ব্বতাদি উচ্চ জমি ধুইয়া গিয়া গহ্বর সকল পলিতে পূর্ণ হইতেছে। একটা উষ্ণ জিনিষ কোন জায়গায় রাখিলে উহা ক্রমে চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যের ন্যায় সমান উষ্ণভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি

---

* স্বামিজী যখন পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলেন তখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু প্রচারিত তাড়িত-প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনত্ব-রূপ (Response of Inorganic matter to Electric currents) অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই।

এইরূপে সঞ্চালন, সংবাহন, বিকীরণাদি (Conduction, convection and radiation) উপায় অবলম্বনে সর্ব্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

"গাছের ফল ফুল পাতা শিকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও বাস্তবিক উহারা যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে। ত্রিকোণ কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিলে এক সাদা রং, রামধনুর সাতটা রঙের মত পৃথক পৃথক বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখিলে একই রং, আবার লাল বা নীল চসমার ভিতর দিয়া দেখিলে সমস্তই লাল বা নীল দেখায়।

"এইরূপ যাহা সত্য, তাহা এক। মায়া দ্বারা আমরা পৃথক পৃথক দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মানুষের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞান উপস্থিত হইলেও মানুষ সেই সত্যকে ধরিতে পারে না, দেখিতে পায় না।"

এই সব কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "স্বামিজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেল আনিয়া সমান্তরালে রাখিলে দেখায় যেন উহারা ক্রমে এক জাগয়ায় মিলিয়া গিয়াছে। উহারই নাম Vanishing point। মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি Optical delusion (দৃষ্টিবিভ্রম)

সর্ব্বদাই হইতেছে। Calcspar নামক পাথরের নীচে একটা রেখাকে Double refractionএ দুটো দেখায়। একটা উড্ পেন্সিল আধ গ্লাস জলে ডুবাইয়া রাখিলে পেন্সিলের জলমগ্ন ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চোখগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা বিশিষ্ট এক একটা লেন্স (Lens) মাত্র। আমরা কোন জিনিষ যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই তদপেক্ষা বড় দেখিয়া থাকে, কেন-না তাহাদের চোখের লেন্স ভিন্নশক্তিবিশিষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখি, তাই যে সত্য, তাহারও ত প্রমাণ নেই। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, মানুষ সত্য সত্য করিয়া পাগল কিন্তু প্রকৃত সত্য (Absolute truth) মানুষের বুঝিবার ক্ষমতা নাই, কারণ, ঘটনাক্রমে প্রকৃত সত্য মানুষের হস্তগত হইলে তাহাই যে বাস্তবিক সত্য, ইহা সে বুঝিবে কি করিয়া ? আমাদের সমস্ত জ্ঞান Relative (আপেক্ষিক), Absolute বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অতএব Absolute ভগবান্ বা জগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝিতে পারিবে না।”

স্বামিজী বলিলেন, “তোমার বা সচরাচর লোকের Absolute জ্ঞান না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কাহারও নাই, এমন কথা কি করিয়া বল ? জ্ঞান এবং

অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া দুই রকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, বাস্তবিক উহা মিথ্যা জ্ঞান। সত্য জ্ঞানের উদয় হইলে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব এক দেখায়। দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত।"

আমি উত্তর করিলাম, "স্বামিজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান দুইটি জিনিষ থাকে, তাহা হইলে আপনি যাহাকে সত্যজ্ঞান ভাবিতেছেন, তাহাও ত মিথ্যাজ্ঞান হইতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলিতেছেন, তাহাও ত সত্য হইতে পারে?"

তিনি বলিলেন, "ঠিক বলেছ, সেইজন্যই বেদে বিশ্বাস করা চাই। আমাদের পূর্ব্বকালে মুনিঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়া ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, আমাদের বিচার করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। যতক্ষণ না, ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়া দাঁড়াইয়া—ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিব, ততক্ষণ কেমন করিয়া বলিব —কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য? শুদ্ধ দুইটি বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হইতেছে, এইরূপ বলা যাইতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাক, তখন অন্যটাকে ভুল বলিয়া মনে

হয়। স্বপ্নে হয় ত কলিকাতায় কেনাবেচা করিলে, উঠিয়া দেখ, বিছানায় শুইয়া আছ। যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হইবে, তখন এক ভিন্ন দুই দেখিবে না ও পূর্ব্বের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিবে। কিন্তু এ সব অনেক দূরের কথা, হাতে খড়ি হইতে না হইতেই রামায়ণ, মহাভারত পড়িবার ইচ্ছা করিলে চলিবে কেন? ধর্ম্ম অনুভবের জিনিষ, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার নহে। হাতে নাতে করিতে হইবে, তবে ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে। এ কথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry (রসায়ন) Physics (পদার্থবিদ্যা) Geology (ভূতত্ত্ববিদ্যা) প্রভৃতিরও অনুমোদিত। দু বোতল Hydrogen (উদ্‌জান) আর এক বোতল Oxygen (অম্লজান) লইয়া 'জল কৈ' বলিলে কি জল হইবে, না, তাহাদের একটা শক্ত জায়গায় রাখিয়া, Electric current (তাড়িত-প্রবাহ) তাহার ভিতর চালাইয়া তাহাদের Combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) করিলে তবে জল দেখিতে পাইবে ও বুঝিবে যে, জল Hydrogen ও Oxygen নামক গ্যাস হইতে উৎপন্ন। অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধি করিতে গেলেও সেইরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণে যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসের

ত কথাই নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্ম্মফল পিঠে বাঁধা রহিয়াছে। একমুহূর্ত্ত শ্মশানবৈরাগ্য হইল, আর বলিলে কি-না, 'কৈ, আমি ত সব এক দেখিতেছি না'।"

আমি বলিলাম, "স্বামিজী, আপনার ঐ কথা সত্য হইলে যে, Fatalism (অদৃষ্টবাদ) আসিয়া পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্ম্মফল একজন্মে যাইবার নয়, তবে আর চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হইবে, তখন আমারও হইবে।"

তিনি বলিলেন, "তাহা নহে। কর্ম্মফল ত অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐ সকল কর্ম্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইতে পারে। ম্যাজিক লণ্ঠনের পঞ্চাশ খানা ছবি দশ মিনিটেও দেখান যায় আবার দেখাতে দেখাতে সমস্ত রাতও কাটান যায়। উহা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।"

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধেও স্বামিজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর,— "সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই চেতন ও অচেতন (সুবিধার জন্য) দুইভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্টবস্তুর চেতনভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্ম্মের মতে, ঈশ্বর আপনার মত রূপবিশিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কেহ বলেন, মানুষ ল্যাজবিহীন বানর

বিশেষ; কেহ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনাশক্তি আছে, তাহার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশী। যাহাই হউক, মানুষ প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশ মাত্র, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি, বুঝিবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া এটা কি, ওটা কি, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; আর অন্যদিকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ হাওয়ায় ও উর্ব্বরা ভূমিতে শরীর রক্ষার জন্য যৎসামান্য সময় মাত্র ব্যয় করিয়া কৌপীন পরিয়া প্রদীপের মিট্‌মিটে আলোতে বসিয়া আদা জল খাইয়া বিচার করিতে লাগিলেন,—এমন জিনিষ কি আছে, যাহা জানিলে সব জিনিষ জানা যায় (What is that by knowing which everything will be known ?)। তাঁহাদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্ব্বাকের দৃশ্য-সত্য মত (Ultra-materialistic theory) হইতে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত পর্য্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্ম্মে পাওয়া যায়। দুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপনীত হইতেছেন ও এক কথাই এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দুই দলই বলিতেছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ ই এক অনির্ব্বচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশ মাত্র। কাল

এবং আকাশও (Time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক কাল, যাহার অনুভবে সূর্য্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়, ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য্য অনাদি নহে; এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন সূর্য্যের সৃষ্টি হয় নাই। আবার এমন সময় আসিবে, যখন আবার সূর্য্য থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে অখণ্ড সময় একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ বা অবকাশ বলিলে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎসম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র বৈ আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও সময়ের মত অনির্ব্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্টবস্তু কোথা হইতে কিরূপে আসিল? সাধারণতঃ আমরা কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখিতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্ত্তা আছেন, কিন্তু তাহা হইলে সৃষ্টিকর্ত্তারও ত সৃষ্টিকর্ত্তা আবশ্যক, তাহা থাকিতে পারে না। অতএব আদিকারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্ব্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের ত

বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐ সকল অনন্ত পদার্থই এক এবং একই ঐ সকলরূপে প্রকাশিত।"

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "স্বামিজী, মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস, যাহা সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা কি সত্য ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "সত্য না হইবার ত কোন কারণ দেখি না। তোমাকে কেহ করুণ স্বরে মিষ্ট-ভাষায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও আর কঠোর তীব্রভাষায় কোন কথা বলিলে তোমার রাগ হয়। তখন প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও যে সুললিত উত্তম শ্লোক (যাহাকে মন্ত্র বলে) দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহার মানে কি ?"

এই সকল কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "স্বামিজী, আমার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় ত আপনি সবই বুঝিতে পারিতেছেন, এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য, আপনি বলিয়া দিন।"

স্বামিজী বলিলেন, "প্রথমে মনটাকে বশে আনিতে চেষ্টা কর. তা যে উপায়েই হোক্, পরে সব আপনিই হইবে। আর জান,—অদ্বৈত জ্ঞান ভারি কঠিন, জানিয়া রাখ যে, উহাই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (Highest ideal), কিন্তু ঐ লক্ষ্যে পৌঁছি-

বার পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্যক। সাধুসঙ্গ ও যথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন উহা অনুভবের অন্য উপায় নাই।”

স্বামিজীর অস্ফুট স্মৃতি

সে আজ ষোড়শ বর্ষ পূর্ব্বের কথা *। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করিয়া সবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যখন হইতে স্বামিজী চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয়কেতন উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই তৎসম্বন্ধীয় যে কোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছি। তখন ২।৩ বৎসর মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি—কোনরূপ অর্থোপার্জ্জনাদিও করি না—সুতরাং কখনও বন্ধুবান্ধবদের বাটী গিয়া, কখনও বা বাটীর নিকটস্থ ধর্ম্মতলায় ইণ্ডিয়ান্ মিরর্ অফিসের বহির্দ্দেশে বোর্ডসংলগ্ন ইণ্ডিয়ান্ মিরর পত্রিকায় স্বামিজীর সম্বন্ধে যে কোন সংবাদ বা তাঁহার যে কোন বক্তৃতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করি। এইরূপে স্বামিজী ভারতে পদার্পণ করা অবধি সিংহলে বা মাদ্রাজে যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রায় সব পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আলমবাজার মঠে গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের নিকট

* সন ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসের 'উদ্বোধনে' এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের নিকটও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্রসমূহ যথা—বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, থিওজফিষ্ট প্রভৃতি—যাঁহার যেরূপ ভাব—তদনুসারে কেহ বিদ্রূপচ্ছলে, কেহ উপদেশদানচ্ছলে, কেহ বা মুরুব্বিয়ানা ধরণে—যিনি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেছেন, তাহাও প্রায় কিছুই জানিতে বাকি নাই।

আজ সেই স্বামী বিবেকানন্দ শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিবেন, আজ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে, তাই প্রত্যূষে উঠিয়াই শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এত প্রত্যূষেই স্বামিজীর অভ্যর্থনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। অনেক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ইংরাজীতে মুদ্রিত দুইটি কাগজ বিতরিত হইতেছে। পড়িয়া দেখিলাম, লণ্ডনবাসী ও আমেরিকাবাসী তাঁহার ছাত্রবৃন্দ তাঁহার বিদায়কালে তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে অভিনন্দনপত্রদ্বয় প্রদান করেন, ঐ দুইটি তাহাই। ক্রমে স্বামিজীর দর্শনার্থী লোকসমূহ দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল। ষ্টেশন-প্লাটফর্ম্ম লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই

পরস্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামিজীর আসিবার আর কত বিলম্ব। শুনা গেল, তিনি একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণে আসিবেন, আসিবার আর বিলম্ব নাই। ঐ যে—গাড়ীর শব্দ শুনা যাইতেছে, ক্রমে সশব্দে ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল।

স্বামিজী যে গাড়ীখানিতে ছিলেন, সেটি যেখানে আসিয়া থামিল, সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলাম। যাই গাড়ী থামিল, দেখিলাম, স্বামিজী দাঁড়াইয়া সমবেত সকলকে করযোড়ে প্রণাম করিলেন। এই এক প্রণামেই স্বামিজী আমার হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। তখন ট্রেণমধ্যস্থ স্বামিজীর মূর্ত্তি মোটামুটি দেখিয়া লইলাম। তার পরেই অভ্যর্থনাসমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া কিছু দূরবর্ত্তী একখানি গাড়ীতে উঠাইলেন। অনেকে স্বামিজীকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সেখানে খুব ভিড় জমিয়া গেল। এদিকে দর্শকগণের হৃদয় হইতে স্বতঃই "জয় স্বামী বিবেকানন্দজীকী জয়", "জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকী জয়"—এই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া সেই আনন্দ-ধ্বনিতে যোগ দিয়া জনতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগি-

লাম। ক্রমে যখন ষ্টেশনের বাহিরে পঁহুছিয়াছি, তখন দেখি, অনেকগুলি যুবক, স্বামিজীর গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম, ভিড়ের জন্য পারিলাম না। সুতরাং সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে দূরে স্বামিজীর গাড়ীর সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ষ্টেশনে স্বামিজীকে অভ্যর্থনার্থ একটি হরিনামসঙ্কীর্ত্তনদলকে দেখিয়াছিলাম। রাস্তায় একটি ব্যাণ্ড বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্বামিজীর সঙ্গে চলিল, দেখিলাম। রিপণ কলেজ পর্য্যন্ত রাস্তা নানাবিধ পতাকা, লতা পাতা ও পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল। গাড়ী আসিয়া রিপণ কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। এইবার স্বামিজীকে বেশ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম, তিনি মুখ বাড়াইয়া কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। মুখখানি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মাক্ত ও মলিন হইয়াছে মাত্র। দুইখানি গাড়ী—একটিতে স্বামিজী এবং মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার—মাননীয় চারুচন্দ্র মিত্র ঐ গাড়ীতে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া জনতাকে নিয়মিত করিতেছেন। অপরটিতে—গুডউইন, হ্যারিসন (সিংহল হইতে স্বামিজীর সঙ্গী জনৈক বৌদ্ধ-

ধর্ম্মাবলম্বী সাহেব), জি, জি, কিডি ও আলাসিঙ্গা নামক তিন জন মাদ্রাজী শিষ্য এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইবার পরই অনেকের অনুরোধে স্বামিজী রিপণ কলেজবাটীতে প্রবেশ করিয়া, সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া দুই তিন মিনিট ইংরাজীতে একটু বলিয়া আবার ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এবার আর শোভাযাত্রা করা হইল না। গাড়ী বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাটীর দিকে ছুটিল। আমিও মনে মনে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

* * * *

আহারাদির পর মধ্যাহ্নে চাঁপাতলায় খগেনদের (স্বামী বিমলানন্দ) বাটীতে গেলাম। তথা হইতে খগেন ও আমি তাহাদের একখানি টমটমে চড়িয়া পশুপতি বসুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। স্বামিজী উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, বেশী লোকজনকে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত পরিচিত, স্বামিজীর অনেক গুরুভাইএর সাক্ষাৎ হইল। স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে স্বামীজির নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় করিয়া দিলেন—"এরা আপনার খুব admirer."

স্বামিজী ও যোগানন্দ স্বামী পশুপতি বাবুর দ্বিতলস্থ একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। অন্যান্য স্বামিগণ উজ্জ্বল গৈরিক বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছিলেন। মেজে কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা প্রণাম করিয়া সেই কার্পেটের উপর উপবেশন করিলাম। স্বামিজী যোগানন্দ স্বামীর সহিত তখন কথা কহিতেছিলেন। আমেরিকা, ইউরোপে স্বামিজী কি দেখিলেন, এই প্রসঙ্গ হইতেছিল। স্বামিজী বলিতেছিলেন,—

"দেখ্ যোগে, দেখ্‌লুম কি জানিস্?—সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা কচ্ছে। আমাদের বাপ দাদারা সেইটেকে religionএর দিকে manifest করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীয়েরা সেইটেকেই মহা রজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest কচ্ছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।"

খগেনের দিকে চাহিয়া তাহাকে খুব রোগা দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, "এ ছেলেটিকে বড় sickly দেখ্‌ছি যে।"

স্বামী শিবানন্দ উত্তর করিলেন, "এটি অনেক দিন থেকে chronic dyspepsiaতে ভুগ্‌ছে।"

স্বামিজী বলিলেন, "আমাদের বাঙ্গালা দেশটা বড় sentimental কি-না, তাই এখানে এত dyspepsia."

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বাটী ফিরিলাম।

*　　*　　*　　*

স্বামিজী এবং তাঁহার শিষ্য মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার্ কাশীপুরে ৺গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। স্বামিজীর মুখের কথাবার্ত্তা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য ঐ স্থানে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করিয়া কয়েকদিন গিয়াছিলাম। তাহার যতগুলি স্মরণ হয়, এইবার তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

স্বামিজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথোপকথন হয়—প্রথম এই বাগানবাটীর একটি ঘরে। স্বামিজী আসিয়া বসিয়াছেন, আমিও গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়াছি, সেখানে আর কেহ নাই। হঠাৎ কেন জানি না—স্বামিজী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি তামাক খাস্?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে না।"

তাহাতে স্বামিজী বলিলেন, "হাঁ, অনেকে বলে—তামাকটা খাওয়া ভাল নয়—আমিও ছাড়্‌বার চেষ্টা কচ্ছি।"

আর একদিন স্বামিজীর নিকট একটি বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত স্বামিজী কথা কহিতেছেন। আমি একটু দূরে রহিয়াছি, আর কেহ নাই। স্বামিজী বলিতেছেন, "বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন পরমাসুন্দরী যুবতী—অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এক নির্জ্জন দ্বীপে গিয়ে কৃষ্ণধ্যানে উন্মত্তা হলেন।" তারপর স্বামিজী ত্যাগ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, "যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ত্যাগের ভাব তেমন উজ্জ্বলরূপে প্রচার নাই, তাহাদের ভিতর শীঘ্রই অবনতি এসে থাকে—যথা—বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়।"

আর একদিন গিয়াছি। দেখি, অনেকগুলি লোক বসিয়া আছেন এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। যুবকটি বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটীর গৃহে থাকে। সে বলিতেছে,—আমি নানা সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছি, কিন্তু সত্য কি নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।

স্বামিজী অতি স্নেহপূর্ণস্বরে বলিতেছেন, "দেখ বাবা, আমারও একদিন তোমারই মত অবস্থা ছিল—তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তোমাকে

কি কি বলেছিল এবং তুমি কি রকমই বা করেছিলে, বল দেখি ?”

যুবক বলিতে লাগিল, “মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশঙ্কর নামক একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন, তিনি আমায় মূর্ত্তিপূজার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, তাহা স্থন্দররূপে বুঝিয়ে দিলেন, আমিও তদনুসারে দিন কতক খুব পূজা অর্চ্চনা কর্‌তে লাগ্‌লুম, কিন্তু তাতে শান্তি পেলুম না। সেই সময় একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, ‘দেখ, মনটাকে একেবারে শূন্য করবার চেষ্টা কর দেখি—তাতে পরম শান্তি পাবে। আমি দিন কতক সেই চেষ্টাই কর্‌তে লাগ্‌লুম, কিন্তু তাতেও আমার মন শান্ত হোল না। আমি, মহাশয়, এখনও একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকি, কিন্তু শান্তিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না। বল্‌তে পারেন, কিসে শান্তি হয় ?”

স্বামিজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলিতে লাগিলেন, “বাপু, আমার কথা যদি শুন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখ্‌তে হবে। তোমার বাড়ীর কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা কর্‌তে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ পথ্য যোগাড় করে দিলে ও শরীরের দ্বারা সেবা-

শুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে—তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ—মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও, বাপু, তা হলে, এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে তুমি মনের শান্তি পাবে।”

যুবকটি বলিল, “আচ্ছা মহাশয়, ধরুন, আমি একজন রোগীর সেবা করতে গেলাম, কিন্তু তার জন্য রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার করে, আমার নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে ?”

স্বামিজী এতক্ষণ যুবকটির সহিত স্নেহপূর্ণস্বরে সহানুভূতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এই শেষ কথাটিতে একটু বিরক্ত হইলেন, বোধ হইল। তিনি একটু বিদ্রূপের ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—

“দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি তোমার নিজের রোগের আশঙ্কা করছ, কিন্তু তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমার বোধ হচ্ছে এবং উপস্থিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও সকলে বেশ বুঝতে পারছেন যে, তুমি এমন কোরে রোগীর সেবা কোন কালে করবে না, যাতে তোমার নিজের রোগ হয়ে যাবে।”

যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না। আমরা বুঝিলাম, লোকটি ‘জ্যাতি’ শ্রেণীর লোক ; অর্থাৎ

জাঁতি যেমন যাহা পায়, তাহাই কাটে, সেইরূপ এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কোন সদুপদেশ শুনিলেই তাহার খুঁত কাটে বা ঐ উপদিষ্ট বিষয়ের মধ্যে দোষভাগ দেখিতেই অগ্রে ছুটিয়া যায় এবং যত ভাল কথাই তাহাদের বল না কেন, সব তর্কযুক্তি করিয়া কাটিয়া দেয়।

আর একদিন মাষ্টার মহাশয়ের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-প্রণেতা শ্রীম—) সঙ্গে কথা হইতেছে। মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন, "দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে ত মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটান, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে ও লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি ?"

স্বামিজী, বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন, "মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয় ? আত্মা ত নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি ?"

মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বুঝিলাম, মাষ্টার মহাশয় দয়া সেবা পরোপকার ইত্যাদি ছাড়িয়া সর্ব্ববিধ অধিকারীর জন্যই জপ তপ ধ্যান ধারণা বা ভক্তির ব্যবস্থা করিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু স্বামিজীর মতে মুক্তিলাভের জন্য ঐগুলির অনুষ্ঠান একপ্রকার অধিকারীর পক্ষে যেরূপ একান্ত

আবশ্যক,. এমন অনেক অধিকারী আছে, যাহাদের পক্ষে আবার পরোপকার দান সেবা ইত্যাদির তদ্রূপই প্রয়োজন। একটিকে উড়াইয়া দিতে গেলে অপরটিকেও উড়াইয়া দিতে হয়, একটিকে লইলে অপরটিকে না লইয়া উপায় নাই। স্বামিজীর ঐরূপ প্রত্যুত্তরে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল, মাষ্টার মহাশয় দয়া সেবাদিকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া অথচ ধ্যান ভজনাদিকে রাখিয়া সঙ্কীর্ণভাবের পোষকতা করিতেছিলেন। স্বামিজীর উদার-হৃদয় ও ক্ষুরধার বুদ্ধি যেন তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তিনি মুক্তিলাভের চেষ্টাকে পর্য্যন্ত মায়ার অন্ত-র্গত বলিয়া অদ্ভুত যুক্তিদ্বারা নির্দ্ধারিত করিলেন এবং দয়া সেবাদির সহিত উহাকে একশ্রেণীভুক্ত করিয়া কর্ম্ম-যোগের পথিককে পর্য্যন্ত আশ্রয় দিলেন।

Thomas â Kempisএর Imitation of Christএর প্রসঙ্গ উঠিল। অনেকেই জানেন, স্বামিজী সংসার ত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি বিশেষ ভাবে চর্চ্চা করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থান কালে তাঁহার গুরুভাইরাও স্বামিজীর দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সদা সর্ব্বদা উহার আলো-চনা করিতেন। স্বামিজী ঐ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন সাহিত্যকল্পদ্রুম নামক মাসিকপত্রে উহার

একটি সূচনা লিখিয়া ঈশানুসরণ নামে ধারাবাহিক অনু-বাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। সূচনাটি পড়িলেই স্বামিজী ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে কিরূপ গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, বুঝা যায়। বাস্তবিকই উহাতে বিবেক বৈরাগ্য দীনতা দাস্য ভক্তি আর্ত্তি প্রভৃতির এত শত শত জ্বলন্ত উপদেশ আছে যে, যিনিই উহা পাঠ করি-বেন, তাঁহারই হৃদয়ে সেই ভাব কিছু না কিছু উদ্দীপিত হইবেই হইবে। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বোধ হয় স্বামিজীর উক্ত গ্রন্থের উপর এখন কিরূপ ভাব জানিবার জন্য উহার ভিতরে দীনতার যে উপদেশ আছে, তাহার প্রসঙ্গ পাড়িয়া বলিলেন,—নিজেকে এইরূপ একান্ত হীন ভাবিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইবে? স্বামিজী শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়? আমরা যে জ্যোতির রাজ্যে বাস কর্‌ছি, আমরা যে জ্যোতির তনয়।"

তাঁহার ঐরূপ প্রত্যুত্তরে বুঝিলাম, স্বামিজী উক্ত গ্রন্থোক্ত ঐ প্রাথমিক সাধন-সোপান অতিক্রম করিয়া সাধন-রাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে তখন উপনীত হইয়াছেন।

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম, সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও তাঁহার তীক্ষ্নদৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে

পারিত না, উহাদেরও সহায়তায় তিনি উচ্চ ধর্ম্মভাব প্রচারের চেষ্টা করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন সাধুগণ যাঁহাকে রামলাল দাদা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন স্বামিজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামিজী একখানি চেয়ার আনাইয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন ও স্বয়ং পায়চারি করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাবিনম্র দাদা তাহাতে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি বসুন, আপনি বসুন।" স্বামিজী কিন্তু কোন মতে ছাড়িবার পাত্র নহেন। অনেক বলিয়া কহিয়া দাদাকে চেয়ারে বসাইলেন ও স্বয়ং বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" দেখিলাম, এত ঐশ্বর্য্য, এত মান পাইয়াও আমাদের স্বামিজীর এতটুকু অভিমানের আবির্ভাব হয় নাই। আরও বুঝিলাম, গুরুভক্তি এইরূপেই করিতে হয়।

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে। স্বামিজী একখানি চেয়ারে ফাঁকায় বসিয়া আছেন। সকলেই তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার ভুটো কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, অথচ সেখানে আর কোন আসন নাই, যাহাতে ছেলেদের বসিতে বলিতে পারেন, কাজেই তাহাদিগকে ভূমিতে

বসিতে হইল। স্বামিজীর বোধ হয় মনে হইতেছিল, ইহাদিগকে বসিবার কোন আসন দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু আবার বুঝি তাঁহার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তা বেশ, তোমরা বেশ বসেছো, একটু একটু তপস্যা করা ভাল।"

আমাদের পাড়ার চণ্ডীচরণ বৰ্দ্ধনকে একদিন লইয়া গিয়াছি। চণ্ডী বাবু Hindu Boys' School নামক একটি ছোটখাট বিদ্যালয়ের সত্ত্বাধিকারী, তাহাতে ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করান হয়। তিনি পূর্ব্ব হইতেই খুব ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন, পরে স্বামিজীর বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তাঁহার উপর খুব শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে সময়ে সময়ে ধর্ম্মসাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া সংসার পরিত্যাগেরও চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হন নাই। দিন কতক সখের থিয়েটারে অভিনয়াদি এবং এক আধখানি নাটক রচনাও করিয়াছিলেন। ইনি একটু ভাবপ্রবণ ধাতের লোক ছিলেন। বিখ্যাত Democrat Edward Carpenter ভারত-ভ্রমণ কালে ইঁহার সহিত আলাপ পরিচয় এবং তাঁহার Adam's Peak to Elephanta নামক গ্রন্থে চণ্ডী বাবুর সহিত আলাপের সংক্ষিপ্ত বিব-রণ ও তাঁহার একখানি চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

চণ্ডী বাবু আসিয়া স্বামিজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, কি রকম ব্যক্তিকে গুরু করা যেতে পারে?"

স্বামিজী বলিলেন, "যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিয়েছিলেন।"

চণ্ডী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা স্বামিজী, কৌপীন পর্‌লে কি কাম দমনের বিশেষ সহায়তা হয়?"

স্বামিজী বলিলেন, "একটু আধটু সাহায্য হতে পারে। কিন্তু যখন ঐ বৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আট্‌কায়? মনটা ভগবানে একেবারে তন্ময় না হয়ে গেলে বাহ্য কোন উপায়ে কাম একেবারে যায় না। তবে কি জান—যতক্ষণ লোকে সেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, ততক্ষণ নানা বাহ্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টা স্বভাবতঃই করে থাকে। আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা বিরক্ত হয়ে আগুনের মাল্‌সার উপর বসেছিলাম। শেষে ঘা শুকাতে অনেক দিন লাগে।"

ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে চণ্ডী বাবু স্বামিজীকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, স্বামিজীও অতি সরল ভাবে সব কথা বুঝাইয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। চণ্ডী বাবু

ধর্ম্মসাধনার জন্য অকপটভাবে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু গৃহী বলিয়া সব সময় মনের মত উহার সাধনা করিতে পারিতেন না, বিশেষতঃ, ব্রহ্মচর্য্য—ধর্ম্মসাধনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া দৃঢ় ধারণা থাকিলেও কার্য্যকালে সম্পূর্ণভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। অধিকন্তু-ছেলেদের লইয়া সদা সর্ব্বদা অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকায়, ধর্ম্মসাধনা ও সৎশিক্ষার অভাবে এবং কুসঙ্গের প্রভাবে অতি অল্পবয়স হইতেই তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য কিরূপে নষ্ট হয়, তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন এবং কি উপায়ে উহা তাহাদের ভিতর পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। কিন্তু 'স্বয়ং অসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়েৎ'? সুতরাং কোনরূপে নিজের ও পরের ভিতর ব্রহ্মচর্য্যভাব প্রবেশ করাইতে অসমর্থ হইয়া সময় সময় বড়ই কাতর হইতেন, এক্ষণে পরম ব্রহ্মচারী স্বামিজীর অকপট উপদেশাবলী ও ওজস্বিনী বাণী শ্রবণ করিয়া হঠাৎ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল, এই মহাপুরুষ একবার মনে করিলে আমাদের ও বালকগণের ভিতর সেই প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য্যভাব নিশ্চিত উদ্দীপিত করিয়া দিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ পূর্ব্বোক্তভাবে উত্তেজিত হইয়া ইংরাজীতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি-

লেন, "Oh. Great Teacher, tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful—how to conquer lust" অর্থাৎ 'হে আচার্য্যবর! যে কাপট্যের আবরণে আমাদিগের যথার্থ স্বভাব গোপন করিয়া আমরা অন্যের নিকটে শিষ্ট শান্ত বা সভ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতেছি, তাহা নিজ দিব্যশক্তিবলে ছিন্ন করিয়া ফেলুন এবং লোকের ভিতর যে ঘোর কাম-প্রবৃত্তি রহিয়াছে, যাহাতে তাহার সমূলে উৎপাটন হইতে পারে —তাহা শিক্ষা দিন্।'

স্বামিজী চণ্ডী বাবুকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিলেন।

পরে Edward Carpenterএর প্রসঙ্গ পড়িল। স্বামিজী বলিলেন, "লণ্ডনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকৃতেন। আরও অনেক Socialist, Democrat প্রভৃতি আস্তেন। তাঁরা বেদান্তোক্ত ধর্ম্মে তাঁদের নিজ নিজ মতের পোষকতা পেয়ে বেদান্তের উপর খুব আকৃষ্ট হতেন।"

স্বামিজী উক্ত Carpenter সাহেবের Adam's Peak to Elephanta নামক গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলেন। এইবার উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত চণ্ডীবাবুর ছবিটির কথা তাঁহার মনে পড়িল; বলিলেন, "আপনার চেহারা

যে বইএ আগেই দেখেছি।” আরও কিয়ংক্ষণ আলাপের পর সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামিজী বিশ্রামের জন্য উঠিলেন। উঠিবার সময় চণ্ডীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “চণ্ডীবাবু, আপনারা ত অনেক ছেলের সংশ্রবে আসেন, আমায় গুটিকতক সুন্দর সুন্দর ছেলে দিতে পারেন?” চণ্ডীবাবু বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। স্বামিজীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম্মপরিগ্রহ করিতে না পারিয়া স্বামিজী যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তখন অগ্রসর হইয়া তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন, “সুন্দর ছেলের কথা কি বল্‌ছিলেন?”

স্বামিজী বলিলেন, “চেহারা দেখ্‌তে ভাল, এমন ছেলে আমি চাচ্ছি না—আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্ম্মঠ, সৎপ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে, তাদের trained কর্‌তে চাই, যাতে তারা নিজেদের মুক্তি সাধনের জন্য ও জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।”

আর একদিন গিয়া দেখি, স্বামিজী ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (‘স্বামি-শিষ্য-সংবাদ’ প্রণেতা) স্বামিজীর সহিত খুব পরিচিতভাবে আলাপ করিতেছেন। স্বামিজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমাদের অতিশয় কৌতূহল হইল। প্রশ্নটি এই—অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য কি? আমরা

শরৎ বাবুকে স্বামিজীর নিকট ঐ প্রশ্নটি উত্থাপিত করিতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা শরৎ বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বামিজীর নিকট যাইয়া, তিনি ঐ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহা শুনিতে লাগিলাম। স্বামিজী উক্ত প্রশ্নের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "বিদেহমুক্তিই যে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা—এ আমার সিদ্ধান্ত, তবে আমি সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জ্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কত বার মুক্তি লাভ হল না বলে প্রায়োপবেশন করে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান, কত সাধন ভজন করেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নাই। এখন কেবল মনে হয়, যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নাই।"

আমি স্বামিজীর উক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ের অপার করুণার কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম; আরও ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কি নিজ দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারপুরুষের লক্ষণ বুঝাইলেন? ইনিও কি একজন অবতার? আরও মনে হইল, স্বামিজী এক্ষণে মুক্ত

হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় উঁহার মুক্তির জন্য আর আগ্রহ নাই।

আর একদিন আমি ও খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) সন্ধ্যার পর গিয়াছি। হরমোহন বাবু (ঠাকুরের ভক্ত) আমাদিগকে স্বামিজীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, "স্বামিজী, এঁরা আপনার খুব admirer এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।" হর-মোহন বাবুর বাক্যের প্রথমাংশ সম্পূর্ণ সত্য হইলেও, দ্বিতীয়াংশটি কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত ছিল। কারণ, আমরা গীতাটাই তখন কতকটা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু বেদান্তের ছোটখাট কয়েকখানা গ্রন্থ ও দুই একখানা উপনিষদের বঙ্গানুবাদ একটু আধটু দেখা ছাড়া ঐ সকল শাস্ত্র ছাত্রের মত উত্তমরূপে আলোচনা করি নাই অথবা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষ্যাদির সাহায্যে পড়ি নাই। যাহা হউক, স্বামিজী বেদান্তের কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠি-লেন, "উপনিষদ্ কিছু পড়েছ?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, একটু আধটু দেখেছি।"

স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ উপনিষদ্ পড়েছ?"

আমি মনের ভিতর হাতড়াইয়া আর কিছু না পাইয়া বলিয়া ফেলিলাম, "কঠ উপনিষদ্ পড়েছি।"

স্বামিজী বলিলেন, "আচ্ছা, কঠটাই বল, কঠ উপনিষদ্ খুব grand—কবিত্বপূর্ণ।"

কি সর্ব্বনাশ! স্বামিজী বুঝি মনে করিয়াছেন, কঠ উপনিষদ্ আমি কণ্ঠস্থ করিয়াছি; আমাকে তাহা হইতে খানিকটা আবৃত্তি করিতে বলিতেছেন। অথচ উহার সংস্কৃতটা একটু আধটু দেখিলেও কখন অর্থ বুঝিয়া পড়িবার বা মুখস্থ করিবার চেষ্টা করি নাই। বড়ই ফাঁপরে পড়িলাম। কি করি! হঠাৎ একটা বুদ্ধি যোগাইল। ইহার কয়েকবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যহ নিয়ম করিয়া কিছু কিছু গীতাপাঠ করিতাম। তাহার ফলে গীতার অধিকাংশই আমার কণ্ঠস্থ ছিল। ভাবিলাম, যাহা হউক কয়েকটা শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি না করিলে আর স্বামিজীর নিকট মুখ দেখাইবার যো নাই। সুতরাং বলিয়া ফেলিলাম, "কঠটা মুখস্থ নেই—গীতা থেকে খানিকটা বলি।"

স্বামিজী বলিলেন, "আচ্ছা, তাই বল।"

তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা" হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জ্জুনের সমুদয় স্তবটা আওড়াইয়া দিলাম।

শুনিয়া স্বামিজী উৎসাহ দিবার জন্য "বেশ, বেশ" বলিতে লাগিলেন। ইহার পরদিন বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ

ঘোষকে সঙ্গে লইয়া স্বামিজীর দর্শনার্থ গিয়াছি। রাজেনকে বলিয়াছি, "ভাই, কাল স্বামিজীর কাছে উপনিষদ্ নিয়ে বড় অপ্রস্তুত হয়েছি। তোমার নিকট উপনিষদ্ কিছু থাকে ত পকেটে করে নিয়ে চল। যদি কাল্কের মত উপনিষদের কথা পাড়েন ত তাই পড়্লেই চল্বে।" রাজেনের নিকট একখানি প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত ঈশকেনকঠাদি উপনিষদ্ ও তাহার বঙ্গানুবাদ পকেট এডিশন ছিল, সেটি পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অদ্য অপরাহ্নে একঘর লোক বসিয়াছিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। আজও—কিরূপে ঠিক স্মরণ নাই—কঠ উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে বাহির করিয়া ঐ উপনিষদের গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পাঠের অন্তরালে স্বামিজী নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা—যে শ্রদ্ধায় তিনি নির্ভীকচিত্তে যমভবনে যাইতেও সাহসী হইয়াছিলেন,—বলিতে লাগিলেন। যখন নচিকেতার দ্বিতীয় বর স্বর্গ-প্রাপ্তির কথা পড়া হইতে লাগিল, তখন সেইখানটা বেশী না পড়িয়া কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয় বরের স্থানটা পড়িতে বলিলেন।

নচিকেতা বলিতেছেন,—মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ—দেহ যাইলে কিছু থাকে কি-না—তার পর যমের নচি-

কেতাকে প্রলোভন প্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে তৎ-সমুদয় প্রত্যাখ্যান। এই সব খানিকটা পড়া হইলে স্বামিজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ঐ সম্বন্ধে কত কি বলিলেন—ক্ষীণস্মৃতি ষোড়শবর্ষে তাহার আর কিছু চিহ্ন রাখে নাই।

কিন্তু এই দুই দিনের উপনিষৎপ্রসঙ্গে স্বামিজীর উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তাহার পর হইতে যখনই সুযোগ পাইয়াছি, পরম শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত অপূর্ব্ব স্বর লয় ও তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যখন পরচর্চ্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চ্চা ভুলিয়া থাকি, তখন শুনিতে পাই—তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণা—

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথা-মৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

'সেই একমাত্র আত্মাকে জান—অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর—তিনিই অমৃতের সেতু।'

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিদ্যুল্লতা চমকিতে

থাকে, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামিজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিতেছেন,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"

'সেখানে সূর্য্যও প্রকাশ পায় না—চন্দ্র তারাও নহে, এই সব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে—তাঁহার প্রকাশে এই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।'

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশে আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামিজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন,—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

* * * *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥”

‘হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।’

যাহা হউক, আর এক দিনের ঘটনার বিষয় এখানে সংক্ষেপে বলিব। এদিনের ঘটনা শরৎবাবু তাঁহার ‘স্বামি-শিষ্য-সংবাদে’ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি অদ্য দ্বিপ্রহরেই উপস্থিত হইয়াছি। দেখি—ঘরের ভিতর একঘর গুজরাটী পণ্ডিত, তাঁহাদের নিকট স্বামিজী বসিয়া অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক বিচার করিতেছেন। জ্ঞান-ভক্তি-নানাবিষয়িণী কথা হইতেছে। ইতিমধ্যে একটা গোল উঠিল। লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, স্বামিজী সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ কি একটা ব্যাকরণের ভুল করিয়াছেন। তাই পণ্ডিত মহাশয়গণ জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যের চর্চ্চা সব ছাড়িয়া দিয়া ঐ ব্যাকরণের খুঁত ধরিয়া “আমরা স্বামিজীকে হারাইলাম” বলিয়া খুব সোরগোল করিতেছেন ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই কথা মনে

পড়িল—"চিল শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে!" যাহা হউক, স্বামিজী বিন্দু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দাসোঽহং পণ্ডিতানাং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্।" খানিকক্ষণ বাদে স্বামিজী উঠিয়া গেলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়গণ গঙ্গায় হাত মুখ ধুইতে গেলেন। আমিও বাগানে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গাতীরে গিয়াছি, শুনিতে পাইলাম, পণ্ডিতগণ স্বামিজীর সম্বন্ধে কি আলোচনা করিতেছেন। শুনিলাম —তাঁহারা বলিতেছেন, "স্বামিজী তাদৃশ পণ্ডিত নন, তবে উঁহার চক্ষুতে এক মোহিনী শক্তি আছে, সেই শক্তি-বলেই তিনি নানাস্থানে দিগ্বিজয় লাভ করিয়াছেন।"

ভাবিলাম, পণ্ডিতগণ ত ঠিক ধরিয়াছেন। চক্ষুতে এ মোহিনী শক্তি না থাকিলে কি এত বিদ্বান্, ধনী মানী, প্রাচ্য পাশ্চাত্য দেশীয় বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারী দাসের ন্যায় ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে? এ ত বিদ্যায় নয়, রূপে নয়, ঐশ্বর্য্যে নয়—এ তাঁহার চক্ষের সেই মোহিনী শক্তিতে।

হে পাঠক, চক্ষে এ মোহিনী শক্তি স্বামিজীর কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিবার জন্য যদি কৌতূহল হয়, তবে তাঁহার শ্রীগুরুর সহিত দিব্য সম্বন্ধ এবং অ

সাধনবৃত্তান্ত একবার শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা কর—ইহার সন্ধান পাইবে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে চার পাঁচ দিন হইল বাড়ী ছাড়িয়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নির্ম্মলানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামিজী দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামিজীর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা, পেরুমল, কিডি, জি-জি প্রভৃতি।

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হইল স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি স্বামিজীকে বলিলেন, "এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।"

স্বামিজী তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ—একটা নিয়ম করা ভাল বৈকি। ডাক্ সকলকে।" সকলে আসিয়া বড় ঘরটিতে জমা হইলেন। তখন স্বামিজী বলিলেন, "একজন কেউ লিখ্‌তে থাক্, আমি বলি।" তখন এ উহাকে সাম্‌নে ঠেলিয়া দিতে লাগিল—কেহ অগ্রসর হয় না, শেষে আমাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার উপর

সাধারণতঃ একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধনভজন করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটিই সার,—আর লেখাপড়াটা—উহাতে মানযশের ইচ্ছা আসিবে, যাহারা ভগবানের আদিষ্ট হইয়া প্রচারকার্য্যাদি করিবে, তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইলেও সাধকদের পক্ষে উহার প্রয়োজন ত নাই-ই, বরং উহা হানিকর—এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি কতকটা forward ও বেপরওয়া—আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। স্বামিজী একবার শূন্যের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি থাক্‌বে ?" (অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারিরূপে তথায় থাকিব, অথবা দুই একদিনের জন্য মঠে বেড়াইতে আসিয়াছি, আবার চলিয়া যাইব।) সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে একজন বলিলেন, "হাঁ।" তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম। নিয়মগুলি বলিবার পূর্ব্বে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, এই সব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝ্‌তে হবে, এগুলি কর্‌বার মূল লক্ষ্য কি ? আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতঃই কতকগুলি কুনিয়ম রয়েছে—সুনিয়মের দ্বারা সেই কুনিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার

চেষ্টা কর্‌তে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে, শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।”

তার পর নিয়মগুলি লেখান হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান জ্ঞান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অপরাহ্নে সকলে মিলিয়া একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থাদি শুনিতে হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে একটু একটু করিয়া ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল। মাদক দ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। শেষে সমুদয় লেখান শেষ করিয়া স্বামিজী বলিলেন, “দেখ্‌, একটু দেখে শুনে নিয়ম-গুলি ভাল করে কপি করে রাখ্‌—দেখিস্‌, যদি কোন নিয়মটা (নেতিবাচক) negative ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive (ইতিবাচক) করে দিবি।”

এই শেষোক্ত আদেশ প্রতিপালনে আমাদিগকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বামিজীর উপদেশ ছিল, লোককে খারাপ বলা বা তাহার বিরুদ্ধে কুসমালোচনা করা, তাহার দোষ দেখান, তাহাকে তুমি অমুক করো না, তমুক করো না,—এইরূপ negative উপদেশ দিলে তাহার উন্নতির বিশেষ সাহায্য হয় না, কিন্তু

তাহাকে যদি একটা আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহার সহজে উন্নতি হইতে পারে, তাহার দোষ-গুলি আপনা আপনি চলিয়া যায়। ইহাই স্বামিজীর মূল কথা। স্বামিজীর সব নিয়মগুলিকে positive করিয়া লইবার উপদেশে আমাদের মনে বারবার ঐ কথাই উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আদেশ মত যখন আমরা সব নিয়মগুলির মধ্য হইতে 'না' কথাটির সম্পর্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম, আর কোন নিয়মে কোন গোল নাই, কিন্তু মাদকদ্রব্য-সম্বন্ধীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটি প্রথম এইভাবে লেখা হইয়াছিল যে, 'মঠে তামাক ব্যতীত কেহ অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না।' যখন আমরা উহার মধ্যগত 'না'টিকে বাদ দিবার চেষ্টা করিলাম, তখন প্রথম দাঁড়াইল—'সকলে তামাক খাইবেন।' কিন্তু ঐরূপ বাক্যের দ্বারা সকলের উপর (যে না খায়, তাহারও উপর) তামাক খাইবার বিধি আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, শেষে অনেক মাথা খাটাইয়া নিয়মটি এইরূপ দাঁড়াইল—'মঠে কেবলমাত্র তামাক সেবন করিতে পারিবেন'—যাহা হউক এখন মনে হইতেছে, আমরা একটা বিকট আপোষ করিয়াছিলাম। Detailএর ভিতর আসিলে, বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে

উড়াইয়া দেওয়া চলে না, তবে ইহাও সত্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি যত মূলভাবের অনুগামী হয়, ততই উহাতে অধিকতর উপযোগিতা দাঁড়ায়। আর স্বামিজীরও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ছিল।

* * * *

একদিন অপরাহ্নে বড়-ঘরে একঘর লোক। স্বামিজী তন্মধ্যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে। তন্মধ্যে আমাদের বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ বসু (বর্ত্তমানে আলিপুর আদালতের স্বনামখ্যাত উকিল) মহাশয়ও আছেন। তখন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নানা সভায়—এমন কি, কখন কখন কংগ্রেসে দাঁড়াইয়াও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার এই বক্তৃতা-শক্তির কথা কেহ স্বামিজীর নিকট উল্লেখ করিলে স্বামিজী বলিলেন, "তা বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন—এখানে দাঁড়িয়ে একটু বক্তৃতা কর দেখি। আচ্ছা—soul (আত্মা) সম্বন্ধে তোমার যা idea (ধারণা), তাই খানিকটা বল।" বিজয়বাবু নানা ওজর করিতে লাগিলেন—স্বামিজী এবং আর আর অনেকেও তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ ১৫ মিনিট অনুরোধ উপরোধের পরও যখন কেহ তাঁহার সঙ্কোচ ভাঙ্গিতে কৃতকার্য্য হইলেন

না, তখন অগত্যা হার মানিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি বিজয়বাবু হইতে আমার উপর পড়িল। আমি মঠে যোগ দিবার পূর্ব্বে কখন কখন ধর্ম্মসম্বন্ধে বাঙ্গলাভাষায় বক্তৃতা করিতাম, আর আমাদের এক ডিবেটিং ক্লাব্ ছিল—তাহাতে ইংরাজী বলিবার অভ্যাস করিতাম। আমার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় কেহ উল্লেখ করাতেই এবার আমার উপর চোট পড়িল, আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি অনেকটা বেপরোয়া, অথবা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে দুকান-কাটা। Fools rush in where angels fear to tread. আমাকে আর বেশী বলিতে হইল না। আমি একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদান্তর্গত আত্মতত্ত্বের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা সম্বন্ধে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া যা মুখে আসিল, বলিয়া গেলাম। ভাষা বা ব্যাকরণের ভুল হইতেছে বা ভাবের অসামঞ্জস্য হইতেছে, এ সকল খেয়ালই করিলাম না। দয়ার সাগর স্বামিজী আমার এই হঠকারিতায় কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমার পরে স্বামিজীর নিকট নূতন সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী *

---

* ইনি সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো (ইউ-এস-এ) বেদান্ত-সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন। আমেরিকায় তাঁহার কার্য্যকাল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ

প্রায় ১০ মিনিটকাল ধরিয়া আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে বলিলেন। তিনি স্বামিজীর বক্তৃতার প্রারম্ভের অনুকরণ করিয়া বেশ গম্ভীর স্বরে নিজ বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। তাঁহারও বক্তৃতার স্বামিজী খুব প্রশংসা করিলেন।

আহা! স্বামিজী বাস্তবিকই কাহারও দোষ দেখিতেন না। যাহার যেটুকু সামান্য গুণ বা শক্তি দেখিতেন, তাহাতেই উৎসাহ দিয়া যাহাতে তাহার ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পাঠকবর্গ, আপনারা একথা হইতে যেন ইহা ভাবিয়া বসিবেন না যে, তিনি সকলকে সকল কার্য্যেই প্রশ্রয় দিতেন। কারণ, বহুবার দেখিয়াছি, লোকের—বিশেষতঃ অনুগত গুরুভ্রাতা বা শিষ্যগণের দোষপ্রদর্শনে তিনি সময়ে সময়ে কঠোরমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। কিন্তু সেটি আমাদের দোষ সংশোধনের জন্য—আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য—আমাদিগকে নিরুৎসাহ করিবার বা আমাদের মত কেবল পরদোষানুসন্ধানবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। আর এরূপ উৎসাহদাতা, ভরসাদাতা

হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই কলিকাতায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বেদান্ত-সমিতিতে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন।

কোথায় পাইব ? কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি, যিনি শিষ্যবর্গকে লিখিতে পারেন, "I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant—*must*, that is my word."—'আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা হইতে পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শূরবীর হইতে হইবে—হইতেই হইবে—নহিলে চলিবে না।'

* * * *

সেই সময়ে স্বামিজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগসম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন হইতে ই, টি, ষ্টার্ডি সাহেব কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে—মঠেও উহার দুই এক কপি প্রেরিত হইতেছে। স্বামিজী দার্জ্জিলিং হইতে তখনও ফেরেন নাই—আমরা পরম আগ্রহসহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরাজী জানেন না—কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 'নরেন' বেদান্ত-সম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাই।

একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, "তোমরা স্বামিজীর এই বক্তৃতাগুলির বাঙ্গলা অনুবাদ কর না।" তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত উক্ত pamphletগুলির মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতিমধ্যে স্বামিজী আসিয়া পড়িয়াছেন। একদিন প্রেমানন্দ স্বামী স্বামিজীকে বলিলেন, "এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।" পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামিজীকে শুনাও দেখি।" তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু স্বামিজীকে শুনাইল। স্বামিজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দুই একটি কথাও বলিলেন। একদিন স্বামিজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, "রাজযোগটা তর্জ্জমা কর্ না।" আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামিজী কেন করিলেন? আমি তাহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে রাজ-যোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম, ঐ যোগের উপর কিছুদিন এত অনুরাগ হইয়াছিল যে, ভক্তি, জ্ঞান বা কর্ম্মযোগকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতাম। মনে

ভাবিতাম, মঠের সাধুরা যোগযাগ কিছু জানেন না, সেইজন্যই তাঁহারা যোগসাধনে উৎসাহ দেন না। স্বামিজীর রাজযোগ গ্রন্থ পড়িয়া ধারণা হয় যে, স্বামিজী শুধু যে রাজযোগে বিশেষ পটু, তাহা নহেন, উক্ত যোগ সম্বন্ধে আমার যে সকল ধারণা ছিল, সে সকল ত তিনি উত্তম-রূপেই বুঝাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য যোগের সহিত রাজযোগের সম্বন্ধও তিনি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। স্বামিজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার ইহা অন্যতম কারণ হইয়াছিল। রাজযোগের অনুবাদ করিলে উক্ত গ্রন্থের উত্তম চর্চ্চা হইবে এবং তাহাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চ্চার অভাব দেখিয়া, সর্ব্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? তিনি ৺প্রমদা দাস মিত্রকে লিখিত একখানি পত্রে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা দেশে রাজযোগের চর্চ্চার একান্ত অভাব—যাহা আছে, তাহা দমটানা ইত্যাদি বই আর কিছু নয়।"

যাহা হউক, স্বামিজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা

প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

* * * *

একদিন অপরাহ্ণে এক ঘর লোক বসিয়া আছে, স্বামিজীর খেয়াল হইল, গীতা পাঠ করিতে হইবে। অমনি গীতা আনা হইল। সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া স্বামিজী গীতা সম্বন্ধে কি বলেন, শুনিতে লাগিলেন। গীতা সম্বন্ধে সেদিন তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দুই চারিদিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। তাহা গীতাতত্ত্ব নামে প্রথমে "উদ্বোধনে"র দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয় ও পরে "ভারতে বিবেকানন্দে"র অঙ্গীভূত করা হয়। সুতরাং কথাগুলি পুনরায় লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ইচ্ছা করি না; কিন্তু এখানে ঐ গীতা-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে স্বামিজীকে যে বিভিন্ন ভাবে ভাবিত দেখিয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা মহাপুরুষের বাক্যাবলী অনেক সময় যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করি বটে, কিন্তু যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই সব বাক্য তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা প্রায় লিপিবদ্ধ থাকে না; আবার মহাপুরুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ না হইলে হাজার বর্ণনা করিলেও লোকে তাঁহাদের ভিতরের জিনিষ লইতে পারে না। তথাপি

তাঁহাদের সম্বন্ধে যতটা যথাযথ লিপিবদ্ধ থাকে, ততটাই—যাঁহাদের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ হয় নাই, তাঁহাদের বড়ই আদরের বস্তু হয়, এবং তাহার আলোচনায় ও ধ্যানে তাঁহাদের কল্যাণ হয়। হে পাঠকবর্গ, সেই মহাপুরুষের যে ছবি এখনও যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে তাহা তোমাদেরও মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হউক। তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আজ আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সেই মহাপণ্ডিত, মহাতেজস্বী, মহাপ্রেমিকের ছবি জাগিতেছে। তোমরাও একবার আমার সহিত দেশকালের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের স্বামিজীকে দেখিবার চেষ্টা কর।

যখন আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি একজন কঠোর সমালোচক—কৃষ্ণার্জ্জুন, ব্যাস, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ-পরম্পরা যখন তন্নতন্নরূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন সময়ে সময়ে বোধ হইতে লাগিল, এ ব্যক্তির নিকট অতি কঠোর সমালোচকও হার মানিয়া যায়। ঐতিহাসিক তত্ত্বের এইরূপ তীব্র বিশ্লেষণ করিলেন বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ে স্বামিজী নিজ মতামত বিশেষভাবে কিছু প্রকাশ না করিয়াই পরে বুঝাইলেন, ধর্ম্মের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নাই। ঐতিহাসিক গবেষণায়

শাস্ত্রবিবৃত ব্যক্তিগণ কাল্পনিক প্রতিপন্ন হইলেও সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গে তাহাতে একটা আঁচড়ও লাগে না। আচ্ছা, যদি ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক না রহিল, তবে ঐতিহাসিক গবেষণার কি কোন মূল্য নাই?—এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামিজী বুঝাইলেন, নির্ভীক ভাবে এই সকল ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্দেশ্য মহান্ হইলেও তজ্জন্য মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং যদি লোকে সর্ব্ববিষয়ে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে সে একদিন সত্যস্বরূপ ভগবানেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। তার পর গীতার মূলতত্ত্বস্বরূপ সর্ব্বমতসমন্বয় ও নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করিয়া শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধার্থ উত্তেজনা বাক্য পড়িয়া তিনি স্বয়ং সর্ব্বসাধারণকে যে ভাবে উপদেশ দেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িল—"নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে" এ ত তোমার সাজে না—তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি ব্রহ্ম, তোমাতে যে নানারূপ ভাববিকৃতি দেখিতেছি—তাহা ত তোমার সাজে না। প্রফেটের মত ওজস্বিনী ভাষায় এই তত্ত্ব বলিতে বলিতে তাঁহার ভিতর হইতে যেন তেজ

বাহির হইতে লাগিল। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখ্‌তে হবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা কর্‌লে চল্‌বে না।" "মহাপাপীকে ঘৃণা করো না" এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ করিতেছে—তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই।

এই এক শ্লোকের মধ্যেই স্বামিজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখিয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, "এই একটিমাত্র শ্লোক পড়্‌লেই সমগ্র গীতা পাঠের ফল হয়।"

* * * *

একদিন ব্রহ্মসূত্র আনিতে বলিলেন। বলিলেন, "ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য না পড়ে এখন স্বাধীন ভাবে সকলে সূত্রগুলির অর্থ বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌।" প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্রগুলি পড়া হইতে লাগিল। স্বামিজী যথাযথভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন; বলিলেন, "সংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা কর্‌লে সকলেই শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ কর্‌তে পারে। কেবল

আমরা ছেলেবেলা থেকে অন্যরূপ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছি —তাই ঐরকম উচ্চারণ এখন আমাদের এত বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা 'আত্মা' শব্দকে 'আত্‌মা' এইরূপ উচ্চারণ না করে 'আত্তাঁ' এই ভাবে উচ্চারণ করি কেন? মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলেছেন, অপশব্দ উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ—আমরা সকলেই ত পতঞ্জলির মতে ম্লেচ্ছ হয়েছি।" তখন নূতন ব্রহ্মচারি-সন্ন্যাসিগণ এক এক করিয়া যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি পড়িতে লাগিলেন। পরে স্বামিজী যাহাতে সূত্রের প্রত্যেক শব্দটি ধরিয়া উহার অক্ষরার্থ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সূত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈতমতেরই পোষক, একথা কে বল্‌লে? শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন—তিনি সকল সূত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোরা সূত্রের অক্ষরার্থ করবার চেষ্টা কর্‌বি—ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি, বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌বি। উদাহরণস্বরূপ দেখ্—'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি'*—এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান বেদব্যাস কর্ত্তৃক সূচিত হয়েছে।"

* ব্রহ্মসূত্র—১।১।১৯।

স্বামিজী একদিকে যেমন গম্ভীরাত্মা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে সুরসিকও ছিলেন। পড়িতে পড়িতে "কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা"* সূত্রটি আসিল। স্বামিজী এই সূত্রটি পাইয়াই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সূত্রটির প্রকৃত অর্থ এই—যখন উপনিষদে জগৎকারণের প্রসঙ্গ উঠাইয়া 'সোঽকাময়ত' —তিনি (অর্থাৎ সেই জগৎকারণ) কামনা করিলেন, এইরূপ কথা আছে, তখন 'অনুমানগম্য' (অচেতন) প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা শাস্ত্রগ্রন্থের নিজ নিজ অদ্ভুত রুচি অনুযায়ী কদর্থ করিয়া এমন পবিত্র সনাতন ধর্ম্মকে ঘোর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, গ্রন্থকারের যাহা কোন কালে অভিপ্রেত ছিল না, তিনি যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এমন সকল বিষয় গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তুরূপে প্রতিপন্ন করিয়া ধর্ম্ম জিনিষটাকে শিষ্টজনের "দূরাৎ পরিহর্ত্তব্য" পদার্থ করিয়া তুলিয়াছে, স্বামিজী কি তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলেন? অথবা যেমন তিনি অন্যান্য অনেক সময় বলিয়াছেন যে, কঠিন শুষ্ক গ্রন্থ আয়ত্ত করাইবার জন্য তিনি তন্মধ্যে সাধারণ মনের উপযোগী রসিকতা প্রবেশ

---

* ব্রহ্মসূত্র—১।১।১৮।

করাইয়া অপরকে সহজেই তাহা আয়ত্ত করাইয়া দিতেন, সেই চেষ্টা করিতেছিলেন ?

যাহা হউক, পাঠ চলিতে লাগিল। ক্রমে "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ"* সূত্র আসিল। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বামিজী প্রেমানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, তোর ঠাকুরও যে নিজেকে ভগবান্ বল্‌তেন, সে ঐ ভাবে বল্‌তেন।" এই কথা বলিয়াই কিন্তু স্বামিজী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর নাভিশ্বাসের সময় বলেছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়'।" এই বলিয়া আবার অন্য সূত্র পড়িতে বলিলেন।

এখানে ঐ সূত্রটি সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদ নামক একটি আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, প্রতর্দ্দন নামক জনৈক রাজা দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করাতে ইন্দ্র তাঁহাকে বর দিতে চান। প্রতর্দ্দন তাহাতে এই বর প্রার্থনা করেন যে, আপনি যাহা মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর মনে করেন, তাহাই বর দিন। তাহাতে ইন্দ্র তাঁহাকে এই উপদেশ দেন, "মাং বিজানীহি"—আমায়

* ব্রহ্মসূত্র—১।১।৩০।

জান। এক্ষণে সূত্রকার ঐ 'আমাকে' অর্থে ইন্দ্র কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এই প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। সমুদয় আখ্যায়িকাটি অধ্যয়ন করিলে প্রথমেই কতকগুলি সন্দেহ হয়—'আমাকে' বলিতে স্থানে স্থানে বোধ হয় যেন ইন্দ্র দেবতাকে বুঝাইতেছে, স্থানে স্থানে আবার প্রাণকে বুঝাইতেছে, কোথাও বা জীবকে বুঝাইতেছে, কোথাও বা আবার ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে—এইরূপ বোধ হয়। এক্ষণে নানাপ্রকার বিচারের দ্বারা সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ঐ স্থলে 'আমাকে' অর্থ ব্রহ্মকে। 'শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সূত্রকার এমন একটি উদাহরণ দেখাইতেছেন, যাহার সঙ্গে ইন্দ্রের এইরূপ ভাবে উপদেশ সঙ্গত হয়। উপনিষদের স্থলবিশেষে আছে, বামদেব ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি মনু, আমি সূর্য্য হইয়াছি'। ইন্দ্রও এইরূপে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমাকে জান' এখানে 'আমি' ও 'ব্রহ্ম' এক কথা।

স্বামিজীও স্বামী প্রেমানন্দকে বলিতেছিলেন,—"পরমহংসদেব যে কখন কখন নিজেকে ভগবান্ বলে নির্দ্দেশ কর্‌তেন, তা ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা হতেই কর্‌তেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সিদ্ধপুরুষমাত্র, অবতার নন্।" এই কথা বলিয়াই কিন্তু জনান্তিকে বলিলেন, "রামকৃষ্ণ

স্বয়ং নিজের সম্বন্ধে বল্‌তেন, 'আমি শুধু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নই, আমি অবতার'।" সুতরাং আমাদের একটি বন্ধু যেমন বলিতেন, রামকৃষ্ণকে শুধু একজন সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ বলিতে পারা যায় না, যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানিতে হয়, নতুবা প্রতারক বলিতে হয়।

যাহা হউক, স্বামিজীর কথায় আমার একটা বিশেষ উপকার হইল। সামান্য ইংরাজী পড়িয়া আর কিছু হউক না হউক, সন্দেহ করিতে বিশেষ শিখিয়াছিলাম। মহাপুরুষগণের শিষ্যগণ তাঁহাদের গুরুকে বাড়াইতে যাইয়া নানারূপ কল্পনা ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় করে, ইহাই অন্তরে অন্তরে সংস্কার ছিল। অদ্ভুত sincerity, সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া, তিনি যে কোনরূপ অতিরঞ্জন করিতে পারেন, এধারণা একেবারে দূর হইয়াছিল। স্বামিজীর বাক্য ধ্রুব সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার বাক্যে পরমহংসদেব সম্বন্ধে এক নূতন আলোক পাইলাম। যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ—এই কথা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, এখন এই কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। স্বামিজীর অপার দয়া, তিনি আমাদিগকে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলেন নাই, ফস্‌ করিয়া কাহারও কথা বিশ্বাস করিতে

বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণ-চরিত্র তোমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যতদূর সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর—আমি ত তাঁহার লক্ষাংশের একাংশও এখনও বুঝ্‌তে পারি নি—ও যত বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌বে, ততই সুখ পাবে, ততই মজ্‌বে।"

* * * *

স্বামিজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া গিয়া সাধনভজন শিখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রথম সকলে আসন করে বস্‌; ভাব্‌,—আমার আসন দৃঢ় হোক্‌, এই আসন অচল অটল হোক্‌, এর সাহায্যেই আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হব।" সকলে বসিয়া কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্তা করিলে তারপর বলিলেন, "ভাব্‌,—আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ—বজ্রের মত দৃঢ়—এই দেহ-সহায়ে আমি সংসারের পারে যাব।" এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন, "এইরূপ ভাব্‌ যে, আমার নিকট হতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চতুর্দ্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর হতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে—সকলের কল্যাণ হোক্‌, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক্‌। এইরূপ ভাবনার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি, অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তার পর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ

নিজ ইষ্টমূর্ত্তির চিন্তা. ও মন্ত্রজপ—এইটি আধ ঘণ্টা আন্দাজ কর্‌বি।” সকলেই স্বামিজীর উপদেশমত চিন্তাদির চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামিজীর আদেশে নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া বহুকাল যাবৎ, “এইবার এইরূপ চিন্তা কর, তার পর এইরূপ কর,” বলিয়া—বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামিজীপ্রোক্ত সাধন-প্রণালী অভ্যাস করাইয়াছিলেন।

* * * *

একদিন সকালবেলা ৯টা ১০টার সময় আমি একটা ঘরে বসিয়া কি করিতেছি—হঠাৎ তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্ম্মলানন্দ) আসিয়া বলিলেন, “স্বামিজীর নিকট দীক্ষা নেবে?” আমিও বলিলাম, “আজ্ঞা হাঁ।” ইতিপূর্ব্বে আমি কুলগুরু বা অপর কাহারও নিকট কোন প্রকার মন্ত্র গ্রহণ করি নাই। জনৈক যোগীর নিকট প্রাণায়ামাদি কয়েকটি যোগের ক্রিয়া লইয়া প্রায় তিন বৎসর সাধন এবং তাহাতে কতকটা শারীরিক উন্নতি ও মনের স্থৈর্য্য লাভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনের অত্যাবশ্যকতা, এবং প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি

প্রভৃতি অন্যান্য পথগুলি একেবারে বৃথা—এইরূপ গোঁড়ামি আমার আদৌ ভাল লাগিত না। অপরদিকে মঠের অন্য কোন কোন সন্ন্যাসী বা তাঁহাদের অনুগত ভক্তগণ যোগের নাম শুনিলেই উড়াইয়া দিতেন ও উহাতে বিশেষ কিছু হয় না, পরমহংসদেব উহার তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না, ইত্যাদি কথা তাঁহাদের নিকট শুনিতে পাইতাম। স্বামিজীর রাজযোগ পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম, এই গ্রন্থের প্রণেতা যেমন যোগমার্গের সমর্থক, তদ্রূপ অন্যান্য মার্গের প্রতিও শ্রদ্ধাসম্পন্ন, গোঁড়া ত নহেনই, বরং এরূপ উদার ভাবের আচার্য্য আমার নয়নপথে কখন পতিত হন নাই—তাহাতে আবার সন্ন্যাসী—সুতরাং তাঁহার প্রতি যে আমার হৃদয়ের বিশেষ শ্রদ্ধা হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরে বিশেষরূপে জানিয়াছি যে, পরমহংসদেব সাধারণতঃ প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়ার উপদেশ করিতেন না। তিনি জপ ও ধ্যানেরই বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, বলিতেন—"ধ্যানাবস্থা প্রগাঢ় হলে বা ভক্তির প্রাবল্যে প্রাণায়াম আপনা আপনি হয়ে যায়, এ সকল দৈহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অনেক সময় দেহের দিকে মন এসে পড়ে;" কিন্তু অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে যোগের উচ্চাঙ্গের সাধনা করাইতেন, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া নিজ আধ্যাত্মিক

শক্তিবলে তাহাদিগের কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিতেন এবং ষট্চক্রের বিভিন্ন চক্রে মনঃস্থৈর্য্যের সুবিধার জন্য সময়ে সময়ে দেহের স্থানবিশেষে আল্‌পিন ফুটাইয়া তথায় মনঃস্থির করিতে বলিতেন। স্বামিজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণের অনেককে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমার বোধ হয়, স্বামিজীর স্বকপোল-কল্পিত নহে, উহা তাঁহার গুরূপদিষ্ট মার্গ। আর একটি কথা স্বামিজী বলিতেন যে, কাহাকেও যথার্থ সৎমার্গে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, তাহারই ভাষায় তাহাকে উপদেশ করিতে হইবে। এই ভাব অনুসরণ করিয়াই তিনি ব্যক্তিবিশেষকে বা অধিকারি-বিশেষকে বিশেষ বিশেষ সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিতেন এবং সর্ব্ববিধ প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই অল্প বিস্তর আধ্যাত্মিক সাহায্য করিতে কৃতকার্য্য হইতেন।

যাহা হউক, আমি এতদিন তাঁহার উপদেশ শুনিতেছি, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক সাহায্য কিছু পাই নাই, পাইবার চেষ্টাও করি নাই। চেষ্টা করি নাই, তাহার কারণ—বলিতে ভরসা হয় নাই—আরও মনে মনে একটা ভাব ছিল বোধ হয় যে, যখন ইঁহার আশ্রিত হইলাম, তখন যাহা প্রয়োজন, সবই পাইব। কি ভাবে আধ্যাত্মিক সাহায্য করিবেন,

তাহাও জানা ছিল না। এক্ষণে নির্ম্মলানন্দ স্বামীর এইরূপ অযাচিত আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধা রহিল না। 'লইব' বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে ঠাকুর-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। জানিতাম না যে, সেদিন শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দীক্ষা লইতেছেন—তখনও দীক্ষাদান শেষ হয় নাই বলিয়া, বোধ হয় ঠাকুর-ঘরের বাহিরে একটু অপেক্ষাও করিতে হইয়াছিল। তার পর শরৎবাবু বাহির হইয়া আসিবামাত্র তুলসী মহারাজ আমাকে লইয়া গিয়া স্বামিজীকে বলিলেন, "এ দীক্ষা নেবে।" স্বামিজী আমাকে বসিতে বলিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সাকার ভাল লাগে, না, নিরাকার ভাল লাগে ?"

আমি বলিলাম, "কখন সাকার ভাল লাগে, কখন বা নিরাকার ভাল লাগে।"

তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, "তা নয় ; গুরু বুঝ্‌তে পারেন, কার কি পথ ; হাতটা দেখি।" এই বলিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অল্পক্ষণ যেন ধ্যান করিতে লাগিলেন। তার পর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তুই কখন ঘটস্থাপনা করে পূজো করেছিস্ ?" আমি বাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে ঘটস্থাপনা করিয়া কোন পূজা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলাম—তাহা বলিলাম। তিনি তখন একটি দেবতার মন্ত্র বলিয়া দিয়া উহা বেশ করিয়া

বুঝাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "এই মন্ত্রে তোর সুবিধে হবে। আর ঘটস্থাপনা করে পূজো করলে তোর সুবিধে হবে।" তৎপরে আমার সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া পরে সম্মুখে কয়েকটি লিচু পড়িয়াছিল—সেইগুলি লইয়া আমায় গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিতে বলিলেন।

আমি দেখিলাম, যদি আমাকে ভগবচ্ছক্তিস্বরূপ কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয়, তবে স্বামিজী যে দেবতার কথা আমায় উপদেশ দিলেন, তাহাই আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিসঙ্গত। শুনিয়াছিলাম, যথার্থ গুরুরা শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া মন্ত্র দেন, স্বামিজীতে আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামিজীর আহার হইল। স্বামিজীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমি ও শরৎবাবু উভয়েই ধারণ করিলাম।

মঠে তখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান মিরার নামক ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীদের এরূপ সংস্থান ছিল না যে, উহার ডাকখরচটা দেন। উক্ত পত্র পিয়ন দ্বারা বরাহনগর পর্য্যন্ত বিলি হইত। বরাহনগরে 'দেবালয়ের' প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শ্রীশশিপদ বন্দোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত একটি বিধবাশ্রম ছিল। তথায় একখানি

করিয়া ঐ আশ্রমের জন্য উক্ত পত্র আসিত। ইণ্ডিয়ান মিরারের পিয়নের ঐ পর্য্যন্ত 'বিট্' বলিয়া মঠের কাগজখানিও ঐখানে আসিত এবং তথা হইতে উহা প্রত্যহ মঠে লইয়া আসিতে হইত। উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামিজীর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থানকালে এই আশ্রমের সাহায্যের জন্য স্বামিজী একটি benefit বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচিয়া যাহা কিছু আয় হয়, তাহা এই আশ্রমেই প্রদত্ত হয়। যাহা হউক, তখন মঠের বাজার করা, ঠাকুর-সেবার আয়োজন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই কানাই মহারাজ বা স্বামী নির্ভয়ানন্দকে করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই ইণ্ডিয়ান মিরার কাগজ আনার ভারও তাঁহার উপরেই ছিল। তখন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জুটিয়াছি, কিন্তু তখনও মঠের প্রয়োজনীয় সমুদয় কর্ম্মের একটা প্রণালীপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া সকলের উপর অল্পাধিক পরিমাণে কাজের ভার দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে যথেষ্ট কার্য্য করিতে হইতেছে। তাঁহারও তাই মনে হইয়াছে যে, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির ভিতর কিছু কিছু যদি নূতন সাধুদের উপর দিতে পারেন, তবে তাঁহার কতকটা

অবকাশ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, "যেখানে ইণ্ডিয়ান মিরার আসে, তোমাকে সেস্থান দেখিয়ে আন্‌বো—তুমি রোজ গিয়ে কাগজখানি এনো।" আমিও ইহা অতি সহজ কাজ জানিয়া এবং উহাতে একজনের কার্য্যভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে ভাবিয়া, সহজেই স্বীকৃত হইলাম। একদিন দ্বিপ্রহরের প্রসাদ ধারণান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়ানন্দ আমাকে বলিলেন, "চল, সেই বিধবাশ্রমটি তোমায় দেখিয়ে দিই।" আমিও তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইয়াছি, ইতিমধ্যে স্বামিজী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "বেদান্তপাঠ করা যাক্—আয়।" আমি—অমুক কার্য্যে যাইতেছি—বলায় আর কিছু বলিলেন না। আমি কানাই মহারাজের সহিত বাহির হইয়া সেইস্থান চিনিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মঠে আমাদের জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট শুনিলাম, আমি চলিয়া যাইবার কিছু পরে স্বামিজী অপরের নিকট বলিতেছিলেন, "ছোঁড়াটা গেল কোথায়? স্ত্রীলোক দেখ্‌তে গেল নাকি?" এই কথা শুনিয়াই আমি কানাই মহারাজকে বলিলাম, "ভাই, চিনে এলুম বটে, কিন্তু কাগজ আন্‌তে সেখানে আমার আর যাওয়া হবে না।"

শিষ্যগণের, বিশেষতঃ, নূতন নূতন ব্রহ্মচারিগণের

যাহাতে চরিত্র রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে স্বামিজী এত সাবধান ছিলেন। কলিকাতায়, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মঠের কোন সাধু-ব্রহ্মচারী বাস করে বা রাত কাটায়—ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না; বিশেষ, যেখানে স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার শত শত উদাহরণ দেখিয়াছি।

যেদিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যাইবেন, সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে যেন এখনও বাজিতেছে,—

"দেখ্ বাবা, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্ম্ম-জীবন লাভ কর্‌তে হলে ব্রহ্মচর্য্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের একদম সংস্পর্শে আস্‌বি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না কর্‌তে বল্‌ছি না, তারা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, কিন্তু নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তাদের কাছ থেকে তোদের তফাৎ থাক্‌তে বল্‌ছি। তোরা যে আমার লেক্‌চারে পড়েছিস্—আমি সংসারে থেকেও ধর্ম্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিস্‌নি যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম-জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি

কর্‌বো, সে সব লেক্‌চারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী—তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের কথা একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার লেক্‌চারে আস্‌তো না। তাদের মতে কতকটা স'য় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের দিকে ঝোঁক হয়, সেইজন্যই ঐ ভাবে লেক্‌চার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভিতরের কথা তোদের বল্‌ছি—ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া এতটুকুও ধর্ম্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন কর্‌বি।"

* * * *

একদিন বিলাত হইতে কি একখানা চিঠি আসিয়াছে, সেই চিঠিখানি পড়িয়া তৎপ্রসঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারকের কি কি গুণ থাকিলে সে কৃতকার্য্য হইতে পারে, বলিতে লাগিলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ধর্ম্মপ্রচারকের এই এই গুলি খোলা থাকা আবশ্যক, ও এই এই গুলি বন্ধ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ তাহার মাথা, হৃদয় ও মুখ খোলা থাকা আবশ্যক,—তাহার প্রবল মেধাবী, হৃদয়বান্‌ ও বাগ্মী হওয়া উচিত, আর তাহার অধোদেশের কার্য্য যেন বন্ধ থাকে, যেন সে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যবান্‌ হয়। জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার অন্যান্য সমুদয়

গুণ আছে, কেবল একটু হৃদয়ের অভাব—যাহা হউক, ক্রমে হৃদয়ও খুলিয়া যাইবে।

সেই পত্রে সিষ্টার নিবেদিতা (তখন মিস্ নোব্‌ল্) বিলাত হইতে শীঘ্র ভারতে রওনা হইবেন, এই সংবাদ ছিল। মিস্ নোব্‌লের প্রশংসায় স্বামিজী শতমুখ হইলেন, বলিলেন, "বিলেতের ভিতর এমন পূতচরিতা, মহানুভাবা রমণী খুব কম। আমি যদি কাল মরে যাই, এ আমার কাজ বজায় রাখ্‌বে।" স্বামিজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

*　　　*　　　*　　　*

বেদান্তের শ্রীভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদক, স্বামিজীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রের প্রধান লেখক, মাদ্রাজের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুত রঙ্গাচার্য্য তীর্থভ্রমণোপলক্ষে শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন, স্বামিজীর নিকট পত্র আসিয়াছে। স্বামিজী মধ্যাহ্নে আমাকে বলিলেন, "চিঠির কাগজ কলম এনে লেখ্ দিকি ; আর একটু খাবার জল নিয়ে আয়।" আমি এক গ্লাস জল স্বামিজীকে দিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিলাম, "আমার হাতের লেখা তত ভাল নয়।" আমি মনে করিয়াছিলাম, বিলাত আমেরিকায় কোন চিঠি লিখিতে হইবে। স্বামিজী অভয় দিয়া বলিলেন, "লেখ্,

foreign letter (বিলাতী চিঠি) নয়।” তখন আমি কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলাম। স্বামিজী ইংরাজীতে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমি লিখিতে লাগিলাম। অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্যকে একখানি লেখাইলেন ; আর একখানি পত্রও লেখাইয়াছিলেন, কাহাকে—ঠিক মনে নাই। মনে আছে—রঙ্গাচার্য্যকে অন্যান্য কথার ভিতর এই কথা লেখাইয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে বেদান্তের তেমন চর্চ্চা নাই, অতএব আপনি যখন কলিকাতায় আসিতেছেন, তখন “give a rub to the people of Calcutta”—কলিকাতাবাসীকে একটু উস্কাইয়া দিয়া যান। কলিকাতায় যাহাতে বেদান্তের চর্চ্চা বাড়ে, কলিকাতাবাসী যাহাতে একটু সচেতন হয়, তজ্জন্য স্বামিজীর কি দৃষ্টি ছিল! নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে চিকিৎসকগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বামিজী কলিকাতায় দুইটি মাত্র বক্তৃতা দিয়াই স্বয়ং বক্তৃতাদানে বিরত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই কলিকাতাবাসীর ধর্ম্মভাব জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামিজীর এই পত্রের ফলেই, ইহার কিছু-কাল পরে কলিকাতাবাসিগণ ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে উক্ত পণ্ডিত-বরের The Priest and the Prophet (পুরোহিত

ও ঋষি) নামক সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

* * * *

একটি বয়স্ক বাঙ্গালী যুবক এই সময় মঠে আসিয়া তথায় সাধুরূপে বাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। স্বামিজী ও মঠের অন্যান্য সাধুবর্গ তাহার চরিত্র পূর্ব্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহাকে আশ্রম-ভুক্ত হইবার অনুপযুক্ত জানিয়া কেহই তাহাকে মঠভুক্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বামিজী তাহাকে বলিলেন, "মঠে যে সকল সাধু আছেন, তাঁদের সকলের যদি মত হয়, তবে তোমায় রাখ্‌তে পারি।" এই কথা বলিয়া পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁকে মঠে রাখ্‌তে তোমাদের কার কিরূপ মত?" তখন সকলেই একবাক্যে তাহাকে রাখিতে অমত প্রকাশ করিলে, উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হইল না। ইহার কিছুকাল পরে শুনিয়াছিলাম, এই ব্যক্তি কোনরূপে বিলাত গিয়াছিল এবং সঙ্গে পয়সা কড়ি না থাকাতে তাহাকে work-houseএ থাকিতে হইয়াছিল।

* * * *

একদিন অপরাহ্নে স্বামিজী মঠের বারান্দায় আমাদিগের

সকলকে লইয়া বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছেন—সন্ধ্যা হয়, হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে স্বামিজী কর্ত্তৃক প্রচার-কার্য্যের জন্য মাদ্রাজে প্রেরিত হওয়ায় তাঁহার অপর একজন গুরুভ্রাতা তখন মঠে পূজা আরাত্রিকাদি কার্য্যভার লইয়াছেন। আরাত্রিকাদি কার্য্যে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, তাঁহাদিগকেও লইয়া স্বামিজী বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ উক্ত গুরুভ্রাতা আসিয়া নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, "চল হে চল, আরতি করতে হবে, চল।" তখন একদিকে স্বামিজীর আদেশে সকলে বেদান্তপাঠে নিযুক্ত, অপর দিকে ইঁহার আদেশে ঠাকুরের আরাত্রিকে যোগদান করিতে হইবে, নূতন সাধুরা একটু গোলে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন স্বামিজী তাঁহার ঐ গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানা ছবির সামনে সল্‌তে-পোড়া নাড়লে আর ঝাঁজ পিট্‌লেই মনে করছিস্ বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়?—তোরা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি," এইরূপ বলিতে বলিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে উক্তরূপে বেদান্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে বেদান্তপাঠ বন্ধ হইয়া গেল—

কিছুক্ষণ পরে আরতিও শেষ হইল। আরতির পরে কিন্তু উক্ত গুরুভ্রাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না, তখন স্বামিজীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া "সে কোথায় গেল, সে কি আমার গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল?" —ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলকেই চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বহুক্ষণ পরে, তাঁহাকে মঠের উপরের ছাদে চিন্তান্বিত ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বামিজীর নিকট লইয়া আসা হইল। তখন স্বামিজীর ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহাকে কত যত্ন করিলেন, তাঁহাকে কত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা স্বামিজীর গুরুভাই-এর প্রতি অপূর্ব্ব ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামিজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। কেবল যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া উদারতর হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। পরে স্বামিজীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, যাঁহাকে স্বামিজী বেশী গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

* * * *

একদিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ্, মঠের একটা ডায়েরি রাখ্‌বি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা করে রিপোর্ট পাঠাবি।"

স্বামিজীর এই আদেশ আমি ও পরে মধ্যে মধ্যে অপর অনেকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখনও মঠের সেই আংশিক ডায়েরি মঠে পরিরক্ষিত আছে। তাহা হইতে এখনও মঠের ক্রমবিকাশের অনেকটা ধারাবাহিক ইতিহাস ও স্বামিজী-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

স্বামিজীর স্মৃতি

(১)

স্বামিজীর বাড়ীর কাছেই আমাদের বাড়ী ছিল। এক পাড়ার ছেলে আমরা ছেলেবেলা লেঙটা হয়ে তাঁর সঙ্গে কত খেলাই না খেলেছি? তার পর তাঁর জীবন আর আমাদের জীবন কত তফাৎ হয়ে গেল। কত দিন কত বৎসর দেখা সাক্ষাৎ হয় নেই। শুন্‌তে পেতুম বটে, তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন, দেশ বিদেশে ঘুরছেন। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তাঁর উপর বিশেষ একটা টান ছিল। তাই বড় হয়েও তাঁর কথা একদিনও ভুল্‌তে পারিনি। তিনি যে একটা খুব বড় লোক হবেন, এটা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে এমন ভাবে যে জগতের পূজ্য হবেন, এ কথা কে ভেবেছিল বল? তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াতে এই কথাই মনে হয়েছিল, হায়, এত বড় শক্তিমান্ পুরুষের জীবনটা মিছেই হয়ে গেল?

তার পর তিনি আমেরিকায় গেলেন। চিকাগোর ধর্ম্মসভার ও আমেরিকার অন্যান্য স্থানের বক্তৃতার সারাংশ

একটু আধটু কাগজে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। যা একটু আধটু বিবরণ পেতুম, তাতেই অবাক হয়ে যেতুম। ভাবলুম, আগুন কখনও কাপড়ে ঢাকা থাকে না। এতদিনে স্বামিজীর ভিতরের সেই শক্তি জ্বলে উঠেছে। ছেলেবেলা-কার সেই ফুল এতদিনে ফুটেছে। যতই তাঁর অদ্ভুত কথা কাগজে পড়তে লাগলুম, ততই সেই বাল্যবন্ধুকে আবার দেখবার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলো।

একদিন শুন্‌লুম, তিনি দেশে ফিরেছেন। মাদ্রাজে এসে, জ্বলন্ত অগ্নিময় বক্তৃতা করেছেন। সে বক্তৃতা পড়ে, প্রাণ মেতে উঠলো। ভাবলুম, হিন্দুধর্ম্মের ভিতর এই জিনিষ আছে ?—আর এমন সহজ করে জলের মত ধর্ম্মটা বোঝান যায় ? এঁর কি অদ্ভুত শক্তি ! ইনি কি মানুষ—না দেবতা ?

তার পর একদিন কলকেতায় ভারি হৈ চৈ ; স্বামিজী এলেন। বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাড়ীতে তাঁর অভ্যার্থনা হলো এবং শীল বাবুদের কাশীপুরের গঙ্গার ধারে বাগানে তাঁকে সঙ্গে করে রেখে আসা গেল। কয়েকদিন পরে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে বিরাট সভায় স্বামিজীর স্নিগ্ধ-গভীর বক্তৃতা হলো—যে যেখান থেকে শুন্‌লে, চিত্রার্পিত হয়ে রইল। সে সব দিনের কথা—সকলেরই মনে আছে। লেখবার আবশ্যক নেই।

কলকেতায় আসা অবধি তাঁর সঙ্গে নির্জ্জনে একবার দেখা করবার এবং প্রাণ খুলে ছেলেবেলাকার মত দুটো কথা বলবার জন্যে মন বড় ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু সর্ব্বদাই লোকের ভিড়। অনবরত বহুলোকের সঙ্গে আলাপ চলেছে। সুবিধামত সময় আর পাই নে। ইতিমধ্যে একটু অবসর পেয়েই তাঁকে ধরে নিয়ে বাগানে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এলুম। তিনিও শৈশবের খেলুড়েকে পেয়ে আগেকার মতই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলেন। দুচারটা কথা বল্‌তে না বল্‌তেই ডাকের উপর ডাক এলো যে, অনেক নূতন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এবার একটু বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, "বাবা একটু রেহাই দাও ; এই ছেলেবেলাকার খেলুড়ের সঙ্গে দুটো কথা কই, একটু ফাঁকা হাওয়ায় থাকি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের যত্ন করে বসাওগে, তামাক-টামাক খাওয়াওগে।"

যে ডাকতে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলুম, "স্বামিজী তুমি সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্যে যে টাকা আমরা চাঁদা করে তুল্‌লুম, আমি ভেবেছিলুম, তুমি দেশের দুর্ভিক্ষের কথা শুনে কলকেতায় পৌঁছুবার আগেই আমাদের তার করবে 'আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না করে দুর্ভিক্ষনিবারণী ফণ্ডে ঐ সমস্ত

টাকা চাঁদা দাও, ; কিন্তু দেখলুম, তুমি তা কর্‌লে না ; এর কারণ কি ?”

স্বামিজী বল্‌লেন, “হাঁ, আমি ইচ্ছেই করেছিলুম যে, আমায় নিয়ে একটা খুব হৈ চৈ হয়। কি জানিস্ ? একটা হৈ চৈ না হলে তাঁর (ভগবান্ রামকৃষ্ণের) নামে লোক চেত্‌বে কি করে ? এত Ovation কি আমার জন্যে করা হলো, না, তাঁর নামেরি জয়জয়কার হলো ? তাঁর বিষয় জানবার জন্যে লোকের মনে কতটা ইচ্ছে হলো। এইবার ক্রমে তাঁকে জান্‌বে, তবে না দেশের মঙ্গল হবে। যিনি দেশের মঙ্গলের জন্যে এসেছেন, তাঁকে না জান্‌লে, লোকের মঙ্গল কি করে হবে ? তাঁকে ঠিক ঠিক জান্‌লে তবে মানুষ তৈরী হবে, আর মানুষ তৈরী হলে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ান কতক্ষণের কথা ? আমাকে নিয়ে এই রকম বিরাট সভা করে হৈ চৈ করে তাঁকে প্রথমে মানুক, আমার এই ইচ্ছেই হয়েছিল ; নতুবা আমার নিজের জন্যে এত হাঙ্গামের কি দরকার ছিল ? তোদের বাড়ী গিয়ে যে একসঙ্গে খেল্‌তুম, তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি ? আমি তখনও যা ছিলুম, এখনও তাই আছি। তুই-ই বল্‌না, আমার কি কোন পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছিস ?”

আমি মুখে বল্‌লুম, “না, সে রকম ত কিছুই দেখ্‌ছিনি।” তবে মনে হল—সাক্ষাৎ দেবতা হয়েছ।

স্বামিজী বল্‌তে লাগ্‌লেন, "দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই, কারণ, সে সব দেশে মানুষ আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক, তখন দুর্ভিক্ষ নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আস্‌বে। ক্রমে সে চেষ্টাও কর্‌বো, দেখ্‌ না।"

আমি। আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেক্‌চার টেক্‌চার দেবে তো? তা না হলে তাঁর নাম কেমন করে প্রচার হবে?

স্বামিজী। তুই খেপেছিস্‌, তাঁর নাম প্রচারের কি কিছু বাকী আছে? লেক্‌চার করে এদেশে কিছু হবে না। বাবু ভায়ারা শুন্‌বে, বেশ বেশ কর্‌বে, হাততালি দেবে; তার পর বাড়ী গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম করে ফেল্‌বে। পচা পুরাণ লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মার্‌লে কি হবে? ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে; তাকে পুড়িয়ে লাল কর্‌তে হবে; তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন কর্‌তে পারা যাবে। এদেশে জ্বলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্‌বে।

তাদের life আগে তয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।

আমি। আচ্ছা, স্বামিজী, তোমার নিজের দেশের লোক নিজেদের ধর্ম্ম বুঝ্‌তে না পেরে কেউ কৃশ্চান, কেউ মুসলমান, কেউ বা অন্য কিছু হচ্ছে, তাদের জন্যে তুমি কিছু না করে, গেলে কি-না আমেরিকা ইংলণ্ডে ধর্ম্ম বিলুতে?

স্বামিজী। কি জানিস্, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বার ও অনুষ্ঠান কর্‌বার শক্তি কি আছে? আছে কেবল একটা অহঙ্কার যে, আমরা ভারী সত্ত্বগুণী। তোরা এককালে সাত্ত্বিক ছিলি বটে, কিন্তু এখন তোদের ভারি পতন হয়েছে। সত্ত্ব থেকে পতন হলে একেবারে তময় আসে। তোরা তাই এসেছিস। মনে করেছিস বুঝি, যে নড়েনা চড়েনা, ঘরের ভেতর বসে হরিনাম করে, সাম্‌নে অপরের উপর হাজার অত্যাচার দেখেও চুপ করে থাকে, সেই-ই সত্ত্বগুণী—তা নয়, তাকে মহা তময় ঘিরেছে। যে দেশের লোক পেটটা ভরে খেতে পায় না, তার ধর্ম্ম হবে কি করে? যে দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটেনি, তাদের নিবৃত্তি কেমন করে হবে? তাই আগে যাতে মানুষ পেটটা ভরে খেতে পায় ও কিছু ভোগবিলাস কর্‌তে পারে,

তারই উপায় কর্, তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্ম্মলাভ হতে পারে। বিলেত আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম ভোগ করে এলে গেছে। তাতে আবার কৃশ্চানী ধর্ম্ম—মেয়েলি ভক্তির ধর্ম্ম, পুরাণের ধর্ম্ম। শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাদের শান্তি হচ্ছে না। তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেই সত্ত্বগুণে পৌঁছায়। তারপর আজ একটা লালমুখ এসে যে কথা বল্‌বে, তা তোরা যত মান্‌বি, একটা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পরা সন্ন্যাসীর কথা তত মান্‌বি কি?

আমি। মহারাজ, এন্, ঘোষও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলেছিলেন।

স্বামিজী। হাঁ, আমার সেখানকার চেলারা সব যখন তৈরী হয়ে এখানে এসে তোদের বল্‌বে যে, "তোমরা কি কর্‌ছ, তোমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম রীতি-নীতি কিসে ছোট? দেখ, তোমাদের ধর্ম্মটাই আমরা বড় মনে করি"—তখন দেখিস হুদো হুদো লোক সেকথা শুনবে। তাদের দ্বারা এদেশের বিশেষ উপকার হবে। মনে করিসনি, তারা ধর্ম্মের গুরুগিরি করতে এদেশে আস্‌বে। বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্রে তারা তোদের গুরু হবে আর ধর্ম্ম বিষয়ে এদেশের লোক তাদের গুরু হবে। ভারতের

সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্ম্ম বিষয়ে এই সম্বন্ধ চিরকাল থাক্‌বে।

আমি। তা স্বামিজী কেমন করে হবে? ওরা আমাদের যেরকম ঘৃণা করে, তাতে ওরা যে কখন নিঃস্বার্থভাবে আমাদের উপকার কর্‌বে, তা বোধ হয় না।

স্বামিজী। ওরা তোদের ঘৃণা কর্‌বার অনেকগুলি কারণ পায়, তাই ঘৃণা করে। একে তো তোরা বিজিত, তার উপর তোদের মত 'হাঘোরের দল' আর জগতে কোথাও নেই। নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে, উঠ্‌তে বস্‌তে জুতো লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন professional ভিখিরী হয়েছে; তাদের উপরশ্রেণীর লোকেরা দু এক পাতা ইংরেজী পড়ে আর্জ্জি হাতে করে সকল আফিসের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বিশ টাকার চাকরি খালি হলে পাঁচশো B.A., M.A., দরখাস্ত করে। পোড়া দর-খাস্তও বা কেমন! "ঘরে ভাত নেই; মাগ ছেলে খেতে পাচ্ছে না, সাহেব দুটি খেতে দাও, নইলে গেলুম!" চাকরিতে ঢুকেও দাসত্বের চূড়ান্ত কর্‌তে হয়। এই তো গেল নিম্নশ্রেণীর লোক। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (?) লোকেরা দল বেঁধে "হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ, তোমরা আমাদের লোকদের চাকরি দাও,

দুর্ভিক্ষ মোচন কর” ইত্যাদি দিনরাত কেবল “দাও দাও” করে মহা হল্লা কর্‌ছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে, “ইংরেজ, আমাদের দাও!” বাপু, আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা দিয়েছে, ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে, বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, আবার কি দিবে? নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা তো এত দিয়েছে, তোরা কি দিয়েছিস?

আমি। আমাদের দেবার কি আছে, মহারাজ? রাজ্যের কর দিই।

স্বামিজী। আমরি! সে কি তোরা দিস, না, জুতো মেরে আদায় করে—রাজ্যরক্ষা করে বলে। তোদের যে এত দিয়েছে, তার জন্যে কি দিস তাই বল্। তোদের দেবার এমন জিনিস আছে, যা ওদেরও নেই। তোরা বিলেত যাবি, তাও ভিখিরী হয়ে, কি-না বিদ্যে দাও। কেউ গিয়ে বড় জোর তাদের ধর্ম্মের দুটো তারিফ করে এলি, বড় বাহাদুরী হলো। কেন, তোদের দেবার কি কিছু নেই? অমূল্য রত্ন রয়েছে, দিতে পারিস—ধর্ম্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ্, যত উচ্চ ভাব পূর্ব্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে; ভাব

প্রসব করে সমস্ত জগৎকে ভাব বিতরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, সেই বেদান্তজ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের গভীর রহস্য নিতে। তোরা ওদের নিকট যা পাস, তার বিনিময়ে তোদের ঐ সকল অমূল্য রত্ন দান কর্। তোদের এই ভিখিরী নাম ঘুচাবার জন্যে ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেবল ভিক্ষে কর্‌বার জন্যে বিলেত যাওয়া ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল ভিক্ষে দেবে? কেউ কখন দিয়ে থাকে? কেবল কাঙ্গালের মত হাত পেতে নেওয়া, জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই হচ্চে আদান-প্রদান। এই নিয়ম যে লোক, বা যে জাত, বা যে দেশ না রাখ্‌বে, তার কল্যাণ হবে না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তাদের ভেতর এখন এতদূর ধর্ম্মপিপাসা যে, আমার মত হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেক দিন থেকে তাদের ধন-রত্ন দিয়েছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ন দে। দেখ্‌বি, ঘৃণাস্থলে শ্রদ্ধা-ভক্তি পাবি, আর তোদের দেশের জন্যে তারা, অযাচিত উপকার করবে। তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না।

আমি। মহারাজ, ওদেশে লেক্‌চারে আমাদের কত

গুণপনা ব্যাখ্যা করে এসেছ; আমাদের ধর্ম্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিয়েছ। আবার এখন বল্‌ছো, আমরা মহা তমোগুণী হয়ে গিছি। অথচ ঋষিদের সনাতন ধর্ম্ম বিলাবার অধিকারী আমাদেরই কর্‌ছো—এ কেমন কথা ?

স্বামিজী। তুই কি বলিস, তোদের দোষগুলো দেশে দেশে গাবিয়ে বেড়াব, না তোদের যা গুণ আছে,—সেই গুণগুলোর কথাই বলে বেড়াব ? যার দোষ তাকেই বুঝিয়ে বলা ভাল, আর তার গুণ দিয়ে ঢাক বাজানই উচিত। ঠাকুর বল্‌তেন যে, মন্দ লোককে ভাল ভাল কর্‌লে সে ভাল হয়ে যায়; আর ভাল লোককে মন্দ মন্দ কর্‌লে সে মন্দ হয়ে যায়। তাদের দোষের কথা তাদের কাছে খুব বলে এসেচি। এদেশ থেকে যত লোক এ পর্য্যন্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের ঘৃণা কর্‌তে শিখেছে। তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি। তোরা যত তমোগুণী হোস না কেন, পুরাতন ঋষিদের ভাবটা তোদের ভেতর একটু-না-একটু আছে—অন্ততঃ তার কাঠামোটা আছে। তবে হুট্ করে বিলেত গিয়েই যে ধর্ম্ম-উপদেষ্টা হতে পারা

যায়, তা নয়। আগে নিরেলা বসে ধর্ম্ম-জীবনটা বেশ করে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণ ভাবে ত্যাগী হতে হবে; আর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য করতে হবে; তোদের ভেতর তমো-গুণ এসেছে—তা কি হয়েছে? তমোনাশ কি হতে পারে না? এক কথায় হতে পারে। ঐ তমোনাশ করবার জন্যেই তো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন।

আমি। কিন্তু স্বামিজী, তোমার মত কে হবে?

স্বামিজী। তোরা ভাবিস, আমি মলে বুঝি আর বিবেকানন্দ হবে না। ঐ যে নেশাখোরগুলো এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেল, যাদের তোরা এত ঘৃণা করিস, মহা অপদার্থ মনে করিস, ঠাকুরের ইচ্ছে হলে ওরা প্রত্যেকে এক এক বিবেকানন্দ হতে পারে, দরকার হলে বিবেকানন্দের অভাব হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে, তা কে জানে? এ—বিবেকানন্দের কাজ নয় রে; তাঁর কাজ—খোদ রাজার কাজ। একটা গভর্ণর জেনারেল গেলে তাঁর জায়গায় আর একটা আসবেই। তোরা যতই তমোগুণী হোস না কেন, মন মুখ এক করে তাঁর শরণ নিলে সব তমঃ কেটে যাবে। এখন যে ও-রোগের রোজা এসেছে। তাঁর নাম করে কাজে লেগে গেলে তিনি আপনিই সব করে নেবেন। ঐ তমোগুণটাই তার সত্ত্বগুণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি। যাই বল, ও-কথা বিশ্বাস হয় না। তোমার মত Philosophyতে oratory কর্‌বার ক্ষমতা কার হবে?

স্বামিজী। তুই জানিস নি। ও-ক্ষমতা সকলের হতে পারে। যে ভগবানের জন্য বার বছর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-চর্য্য কর্‌বে, তারই ও-ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ ব্রহ্ম-চর্য্য করেছি, তাই আমার মাথার ভিতর একটা পর্দ্দা খুলে গিয়েছে। তাই আর আমার দর্শনের ন্যায় জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে বার কর্‌তে হয় না। মনে কর্, কাল বক্তৃতা দিতে হবে, যা বক্তৃতা দেব, তার সমস্ত ছবি আজ রাত্রে পর পর চোখের সাম্‌নে যেতে আরম্ভ হয়। পরদিন বক্তৃতার সময় সেই সব বলি। অতএব বুঝ্‌লি তো এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। যে অভ্যাস কর্‌বে তারই হবে। তুই কর্, তোরও হবে। আমা-দের শাস্ত্রেতেও অমুকের হবে, অমুকের হবে না, তা বলে না।

আমি। মহারাজ, তোমার মনে আছে, তখন তুমি সন্ন্যাস লও নাই, একদিন আমরা অমুকের বাড়ীতে বসে-ছিলুম; তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ছিলে। কলিকালে ওসব হয় না বলে আমি তোমার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় তুমি জোর করে

বলেছিলে, "তুই সমাধি দেখ্‌তে চাস, না সমাধিস্থ হতে চাস ? আমার সমাধি হয়। আমি তোর সমাধি করে দিতে পারি।" তোমার এই কথা বল্‌বার পরেই একজন নূতন লোক এসে পড়্‌লো আর আমাদের ঐ বিষয়ের কোন কথাই চল্‌লো না।

স্বামিজী। হাঁ ; মনে পড়ে।

আমি তখন আমায় সমাধিস্থ করে দেবার জন্যে তাঁকে বিশেষরূপে ধরায় স্বামিজী বল্‌লেন, "দেখ্‌, গত কয়েক বৎসর ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আর কাজ করে আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে। তাই সে শক্তি এখন চাপা পড়েছে। কিছুদিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বসলে তবে আবার সে শক্তির উদয় হবে।"

এর দুএকদিন পরে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা কর্‌বো বলে আমি বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় দুটি বন্ধু এসে উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, তাঁরাও স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হলুম। দেখ্‌লুম, স্বামিজী হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আসছেন। শুধু হাতে দেবতা বা সাধু দর্শন করতে যেতে নেই শুনেছিলুম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলুম। তিনি আসবামাত্র

তাঁকে সেইগুলি দিলুম, স্বামিজী সেগুলি নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকালেন এবং আমরা প্রণাম কর্‌বার আগেই আমাদের প্রণাম কর্‌লেন। আমার সঙ্গের দুটি বন্ধুর মধ্যে একটি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিন্তে পেরে বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁর সমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, পরে তাঁর নিকটে আমাদের বসালেন। আমরা যেখানে বসলুম, সেখানে আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামিজীর মধুর কথা শুন্‌তে এসেছেন। অন্যান্য লোকের দুএকটি প্রশ্নের উত্তর করে কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী আপনিই প্রাণায়ামের কথা কইতে লাগ্‌লেন। মনোবিজ্ঞান হতেই জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান সহায়ে প্রথমে ত বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তুটা কি, বুঝাতে লাগ্‌লেন। এর আগে আমরা কয়জনেই তাঁর রাজযোগ পুস্তকখানি ভাল করে পড়েছিলুম। কিন্তু আজ তাঁর কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে সকল কথা শুন্‌লুম, তাতে মনে হল যে, তাঁর ভেতর যা আছে, তার অতি অল্পমাত্রই সে পুস্তকে লিপি-বদ্ধ হয়েছে। এতে বুঝলুম যে, তাঁর ঐ সকল কথা কেবল পুঁথি-পড়া কথা নয়। মন্ত্রদ্রষ্টা ছাড়া ধর্ম্মশাস্ত্রের কূট প্রশ্ন সকলের বিজ্ঞান সহায়ে ঐরূপ বিশদ মীমাংসা করা কারও সাধ্য নয়। জগতে পণ্ডিতের অভাব নেই;

কিন্তু সত্যের দ্রষ্টা বা উপলব্ধা বড়ই বিরল। পণ্ডিতের সংখ্যা কমে তাঁর ন্যায় দ্রষ্টার সংখ্যা যদি অধিক হতো, তা হলে ভারতের এ দুর্দ্দিন হতো না।

সেদিন আমরা স্বামিজীর কাছে ৩৷৷° টার সময় উপস্থিত হই। তাঁর প্রাণায়াম বিষয়ক কথা ৭৷৷°টা পর্য্যন্ত চলেছিল। পরে সভা ভঙ্গ হলে যখন বাইরে এলুম, তখন সঙ্গিদ্বয় আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, তাঁদের প্রাণের ভেতরের প্রশ্ন স্বামিজী কেমন করে জান্‌তে পার্‌লেন? আমি কি তাঁকে পূর্ব্বেই এ প্রশ্নগুলি জানিয়েছিলুম?

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বাগবাজারের পরলোকগত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গিরীশবাবু, অতুলবাবু, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ এবং আরও দুএকটি বন্ধুর সম্মুখে স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "স্বামিজী, সেদিন আমার সঙ্গে যে দুজন লোক তোমায় দেখ্‌তে গিয়েছিল, তুমি এ দেশে আসবার আগেই তারা তোমার রাজযোগ পড়েছিল আর বলে রেখেছিল যে, যদি তোমার সঙ্গে কখন দেখা হয় তো তোমাকে প্রাণায়াম বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বে। কিন্তু সেদিন তারা কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে না কর্‌তেই তুমি তাদের ভেতরের সন্দেহগুলি আপনি তুলে ঐরূপে মীমাংসা করায়

তারা আমায় জিজ্ঞাসা কর্ছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি আগে জানিয়েছিলুম কি-না।”

স্বামিজী বল্লেন্, “ওদেশেও অনেক সময়ে ঐরূপ ঘটনা হওয়ায় অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা কর্তো, আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন করে জান্তে পার্লেন ? ওটা আমার তত হয় না। ঠাকুরের অহরহ প্রায়ই হতো।”

এই প্রসঙ্গে অতুল বাবু জিজ্ঞাসা কর্লেন, “তুমি রাজযোগে বলেছ, যে, পূর্ব্ব জন্মের কথা সমস্ত জান্তে পারা যায়। তুমি নিজে জান্তে পার ?”

স্বামিজী। হাঁ পারি।

অতুল বাবু। কি জান্তে পার, বল্বার বাধা আছে ?

স্বামিজী। জান্তে পারি—জানি-ও, কিন্তু details বল্বো না।

স্বামিজীর স্মৃতি

(২)

নরেন্দ্রনাথ হেদোর ধারে জেনারেল এসেমব্লি কলেজে পড়েন। এফ, এ, সেইখান হইতেই পাশ করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্যগুণে সহপাঠীরা অনেকে বড়ই বশীভূত। তাঁহারা তাঁহার গান শুনিতে এতই ভালবাসিতেন যে, অবকাশ পাইলেই নরেনের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তথায় বসিয়া একবার তাঁহার তর্ক যুক্তি বা গান বাজনা আরম্ভ হইলে সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা বুঝিতে পারিতেন না।

নরেন্দ্র এখন তাঁহার পিত্রালয়ে দুই বেলা কেবল আহার করিতে যান, আর সমস্ত দিবা রাত্র নিকটে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাটীতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করেন। পাঠাভ্যাসের খাতিরেই যে এখানে থাকেন তাহা নহে। নরেন্দ্র নিভৃতে থাকিতে ভালবাসেন। বাড়ীতে অনেক লোক, বড় গোলমাল, নিশীথে ধ্যান জপের বড়ই ব্যাঘাত। মাতামহীর বাটীতে লোক বেশী নয়, দুই একজন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের দ্বারা নরেনের কোন

ব্যাঘাত ঘটে না। কচি কাচা ছেলে—যাহাদের দ্বারাই অধিক গোলমাল হয়—এখানে একটিও নাই। যে ঘরটিতে নরেন থাকেন তাহা বার-বাড়ীর দোতলায়। ঘরের সম্মুখেই উঠিবার সিঁড়ী। অন্দর মহলের সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব নাই। সুতরাং তাঁহার বন্ধুবান্ধবের—যাঁহার যখন ইচ্ছা—আসিয়া উপস্থিত হন। নরেন নিজের এই অপূর্ব্ব ছোট ঘরটির নাম রাখিয়াছিলেন 'টং'। কাহাকেও সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন, "চল, টংএ যাই।" ঘরটি বড়ই ছোট, প্রস্থে চারি হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা ছোট একটি বালিস। মেঝের উপর একটি ছেঁড়া সপ পাতা। এক কোণে একটি তম্বুরা। তাহারই নিকট একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখন ঐ মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে, কখন বা খাটিয়ার নীচে কখন বা তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে। ঘরের এক পার্শ্বে একটি থেলো হুঁকো, তাহার নিকট খানিকটা তামাকের গুল আর ছাই ঢালিবার একখানি সরা। তাহারই কাছে তামাক টিকে ও দেশালাই রাখিবার একখানি মৃৎ-পাত্র। আর কুলুঙ্গিতে, খাটের উপর, মাদুরের উপর হেথা সেথা ছড়ান পড়িবার পুস্তক। একটি দেওয়ালে একটি দড়ি খাটান, তাহাতে

কাপড় পিরান ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরে দুটি একটি ভাঙ্গা শিশিও রহিয়াছে ; সম্প্রতি তাঁহার পীড়া হইয়াছিল তাহারই নজির। নরেন মনে করিলেই বাড়ী হইতে পরিষ্কার বালিস, উত্তম বিছানা ও ভাল দ্রব্যাদি আনিয়া দুই একখানি ছবি প্রভৃতি দিয়া ঘরটি বেশ সাজাইতে পারিতেন। করিতেন না যে, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার ওসমস্ত দিকে কোনও প্রকার খেয়ালই ছিল না। সেজন্য ঘরে সর্ব্বত্র একটা যেন বাসাড়ে বাসাড়ে ভাব। প্রকৃত কথা, আত্মতৃপ্তির বাসনা তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে কোন বিষয়ে দেখা যাইত না।

নরেন্দ্র আজ মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় কোন বন্ধুর আগমন হইল, বেলা এগারটা। আহারাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছিলেন। বন্ধু আসিয়া নরেনকে বলিলেন, "ভাই, রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা।"

অমনি নরেন পড়িবার বই মুড়িয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিলেন। তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেতারের সুর বাঁধিয়া নরেন গান ধরিবার আগে বন্ধুকে বলিলেন, "তবে বাঁয়াটা নে।"

বন্ধু কহিলেন, "ভাই, আমি ত বাজাতে জানিনে।

ইস্কুলে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারব ?”

অমনি নরেন আপনি একটু বাজাইয়া দেখাইলেন ও বলিলেন, “বেশ করে দেখেনে দিখি। পারবি বৈকি, কেন পারবিনি ? কিছু শক্ত কাজ নয়। এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা, তা হলেই হবে।” সঙ্গে সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলিয়া দিলেন। বন্ধু দুই একবার চেষ্টা করিয়া কোন রকমে ঠেকা দিতে লাগিলেন, গান চলিল। তান-লয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল, টপ্‌পা, ঢপ, খেয়াল, ধ্রুপদ, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময় নরেন এমনি সহজভাবে বোলসহ ঠেকাটি দেখাইয়া দিতেছেন যে, কাওয়ালী, একতালা, আড়াঠেকা, মধ্যমান এমন কি সুরফাঁকতাল পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও আপনি খাইতেছেন ; সেটা কেবল বাজান কার্য্য হইতে একটু অবসর না লইলে হাত যে যায়। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নাই, হিন্দী গান হইলে নরেন তাহার মানে বলিতেছেন ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাব তরঙ্গের সহিত সুরলয়ে অপূর্ব্ব ঐক্য দেখাইয়া বন্ধুকে বিমোহিত করিতে-ছেন। দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল,

বাড়ীর চাকর আসিয়া একটি মিটমিটে প্রদীপ দিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুই জনের হুঁস হইলে সেদিনকার মত পরস্পর বিদায় লইয়া নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনার্থ চলিয়া গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রকারে নরেনের পাঠে কতই যে ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বলা যায় না। নরেনের সহিত এই সময়ে যাঁহারই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তিনিই এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়াছেন। কিন্তু ব্যাঘাত যতই হউক না কেন, নরেন্দ্র নির্ব্বিকার।

একদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নরেন অনেক দিন তাঁহার নিকট না যাওয়ায়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাম-লালের সঙ্গে কলিকাতায় নরেনের 'টং'এ আগমন করেন। সেদিন সকালে নরেনের ঘরে দুই সহপাঠী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্ন্যাল বসিয়া কখন পাঠ করিতেছেন, আবার কখন বা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। এমন সময় বহির্দ্বারে 'নরেন, নরেন' শব্দ শুনা গেল। স্বর শুনিয়াই নরেন অতীব ব্যস্ত হইয়া দ্রুত নীচে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার বন্ধুরাও বুঝিলেন, পরমহংসদেব আসিয়াছেন তাই নরেন এত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গেলেন। বন্ধুরা দেখিলেন, সিঁড়ীর মধ্যস্থলে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে দেখিয়াই অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ স্বরে বলিতে

লাগিলেন, "তুই এতদিন যাসনি কেন? তুই এতদিন যাসনি কেন?" বারংবার এই বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া বসিলেন, পরে আপনার গামছায় বাঁধা সন্দেশ ছিল, খুলিয়া নরেনকে, "খা, খা" বলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। নরেনকে দেখিতে যখনই আসেন তখনই কিছু না কিছু অতি উত্তম খাদ্য দ্রব্য তাঁহার জন্য বাঁধিয়া আনেন; মধ্যে মধ্যে লোক দ্বারা পাঠাইয়াও দেন। নরেন একলা খাইবার পাত্র নহেন, তাহা হইতে কতকগুলি সন্দেশ লইয়া অগ্রে তাঁহার বন্ধুদের দিয়া তবে খাইলেন। রামকৃষ্ণ তৎপরে বলিলেন, "ওরে, তোর গান অনেক দিন শুনিনি, গান গা।" অমনি তানপুরা লইয়া তাহার কাণ মলিয়া স্থর বাঁধিয়া নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন।

ভৈরবী—একতালা

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপিণী।
(তুমি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী)
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃষাণু, তাপিতা হইল তনু।
মূলাধার ত্যজ শিবে, স্বয়ম্ভূ-শিব-বেষ্টিনী॥
গচ্ছ সুসুম্নারি পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত।
মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী॥

শিরসি সহস্র দলে, পরম শিবেতে মিলে।
ক্রীড়া কর কুতূহলে, সচ্চিদানন্দ-দায়িনী॥

গানও আরম্ভ হইল শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। গানের স্তরে স্তরে মন ঊর্দ্ধে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, মুখাবয়ব অমানুষীভাব ধারণ করিল, ক্রমে মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্ব্বে কোন মানুষের এরূপ ভাব দেখেন নাই। তাঁহারা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝিবা শরীরে সহসা কোন পীড়া হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মহা ভীত হইলেন। দাশরথি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাঁহার মুখে সিঞ্চন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, নরেন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "জল দেবার দরকার নেই। উনি অজ্ঞান হননি, ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হবে এখন।" নরেন্দ্র এইবার শ্যামা-বিষয়ক গান ধরিলেন, "একবার তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ মা শ্যামা"—এইরূপ শ্যামা-বিষয়ক অনেক গান হইল। কৃষ্ণ-বিষয়ক গানও অনেক হইল। গান শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণ কখন ভাবাবিষ্ট হইতেছেন আবার কখন বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। নরেন্দ্র অনেক্ষণ ধরিয়া গান গাহিলেন। অবশেষে গান শেষ হইলে রামকৃষ্ণ

কহিলেন, "দক্ষিণেশ্বর যাবি ? কদিন যাসনি। চল্ না, আবার এখনই ফিরে আসিস।" নরেন্দ্র তখনই সম্মত হইলেন। পুস্তকাদি যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল তেমনই পড়িয়া রহিল, কেবল মাত্র তানপুরাটি যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিয়া গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন, বন্ধুরা স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের পড়াশুনায় এবংবিধ বহু অন্তরায় তাঁহার অনেক বন্ধুই দেখিয়াছেন, কিন্তু সাহস করিয়া তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না। একদিন উক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বৃথা সময় নষ্ট হয় ভাবিয়া তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "ভাই, ধর্ম্মের জন্যে তোমার যে রকম আবেগ তাতে তুমি নিশ্চয়ই শীঘ্র উৎকৃষ্ট গুরু পাবে।" নরেন্দ্র বেশ বুঝিলেন যে, বন্ধুটি রামকৃষ্ণকে একজন সামান্য ব্যক্তি মনে করিয়াই এইরূপ কহিয়াছেন। নরেন্দ্র বন্ধুর কথায় মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন কথায় কথায় বলিয়া ফেলি-লেন,—"ভাই, হরিদাস আমার গুরুদেবকে সামান্য লোক মনে করে। তা সে যা হোক।

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দরায়'।"

ইহার বহুকাল পরে লেখকের নিকট হরিদাস এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “ভাই, তখন কি আমরা পরমহংসদেবকে চিনতে পেরেছিলুম ? ভাগ্যগুণে নরেন তাঁকে চিনেছিল, আর আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই তখন বুঝতে পারিনি।”

হরিদাস এইরূপ কত দুঃখ প্রকাশ করিতেন ও তাঁহার নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিত।

বি, এ, পরীক্ষার জন্য টাকা জমা দিবার সময় আসিল, সকলেই আপন আপন বেতন ও পরীক্ষার ফী জমা দিল। হরিদাসের অবস্থা ভাল নয়, তাহার উপর এক বৎসর কাল বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হয় নাই। তখন এই প্রকার ধারে পড়াশুনা জেনারেল এসেম্ব্লিতে চলিত। পরীক্ষার সময় সমস্ত টাকা আদায় করা হইত। যাহারা নেহাৎ সমস্ত বেতন দিতে অপারগ তাহাদের কিছু কিছু, আবার তেমন তেমন স্থলে সমস্তই, ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই সমস্ত ছাড়-ছুড়ের ভার রাজকুমার নামক একজন বৃদ্ধ কেরাণীর উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত। রাজকুমার সাদাসিদে লোক, একটু আধটু নেশাটা আশ্‌টা করেন, কিন্তু গরিব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া। তাঁহার দয়ার গুণেই অক্ষম ছাত্রেরা বিনা বেতনেই পড়িতে পায়। বেতন সম্বন্ধে রাজকুমারের উপর কর্ত্তৃপক্ষের

বিশ্বাস প্রগাঢ়। রাজকুমার, স্বয়ং তদন্ত করিয়া কাহাকেও অর্দ্ধ বেতন, কাহাকে বা বিনা বেতনে ভর্ত্তি করেন। রাজকুমার যাহা করেন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাই মঞ্জুর করিয়া লন। কাজেই ছাত্রমহলে রাজকুমারের বেজায় প্রতিপত্তি। সকলেই বুড়ো কেরাণীকে বড়ই ভালবাসে, রাজকুমারও ছেলের জহুরী, কে কেমন ছেলে বেশ পাকা রকম জানেন। নরেনের অক্ষম বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কোনও উপায়ে ফীর টাকার জোগাড় করিয়াছেন, সম্বৎসরের বেতনের টাকা কিন্তু জোগাড় করিতে না পারিয়া এক-দিন নরেন্দ্রকে সে কথা জানাইলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, "তুই ভাবিসনি, এক্জামিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্তুত হ। আমি রাজকুমারকে বলে সব ঠিক করে দেব। তোর মাইনেটা মাপ করিয়ে দেব। কেবল ফীর জোগাড়টা করিস।"

বন্ধু উত্তর করিলেন "ভাই, ফীর জোগাড় আছে। মাইনেটা মাপ হলে সব গোল মিটে যায়।"

নরেন কহিলেন, "তবে ভাবনা কি, সব ঠিক হবে এখন।" দুই একদিন পরে তাঁহারা দুই বন্ধু একত্রে কেরাণী রাজকুমারের ঘরের সম্মুখে পদচারণ করিতে করিতে গল্প করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আরও অনেক ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে রাজকুমার

আসিলেন। অনেক ছেলে একত্রে দেখিয়া রাজকুমার একবার সকলের বাকি বকেয়া বেতনের তাগাদা করিলেন; একটু জোর তাগাদা,—"অমুকদিনের মধ্যে যে মাইনের টাকা না দেবে এবার তাকে পাঠান হবে না।" ছেলেরা রাজকুমারকে ঘেরিয়া আপন আপন দুঃখকাহিনী বলিয়া বকেয়া বেতনের ক্ষমার জন্য আব্দার করিতে লাগিল। কতকগুলি ভালছেলে রাজকুমারের প্রিয়পাত্র। অন্য ছেলেদের বিষয় তদন্ত করিতে হইলে রাজকুমার অনেক সময় তাহাদের দ্বারাই করেন। নরেন তাহাদের মধ্যে একজন এবং নরেন্দ্র বেশ জানিতেন যে, তাঁহার উপরোধ রাজকুমার এড়াইতে পারিবেন না। রাজকুমারের মাথায় কাঁচায় পাকায় চুল, গোঁফও তদ্রূপ; কেবল তাহার উপর তামাকের ছোপের দাগ দুই পার্শ্বে; কখন তাঁহার চাপ্‌কানের বা জামার বোতাম দেওয়ার অবকাশ হইত না, কাঁধে চাদরখানি জাহাজী কাছির মত পাকান। রাজকুমার যাইয়া আপনার চেয়ারের হাতলে চাদরখানি বাঁধিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। অমনি ঝন্ ঝন্ শব্দে ছেলেরা টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমারের চারি ধারে বেজায় ভিড়। নরেন্দ্র ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া কহিলেন, "মোশাই, অমুক দেখ্‌ছি মাইনেটা দিতে পারবে না। তা আপনি একটু অনুগ্রহ করে

তাকে মাপ করে দিন। তাকে পাঠালে সে ভাল রকম পাশ হবে। আর না পাঠালে তার সব মাটি হয়।"

রাজকুমার দাঁত মুখ খিঁচাইয়া "তোকে জ্যাঠামি করে সুপারিস করতে হবে না, তুই যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা। আমি ওকে মাইনে না দিলে পাঠাব না।"

নরেন্দ্র তাড়া খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া আসিলেন; তাঁহার বন্ধুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, অতীব বিমর্ষ হইয়া নরেনের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ক্লাসে চলিলেন। নরেন্দ্র অপদস্থ হইবার পাত্র নহেন, বন্ধুর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া কহিলেন, "তুই হতাশ হচ্ছিস কেন? ওবুড়ো অমন তাড়াতুড়ি দেয়। আমি বল্‌ছি তোর একটা উপায় করে দেব, তুই নিশ্চিন্ত হ। আমি যেমন করে পারি তোর একটা উপায় কর্‌বো। তোর একজামিন দিতে পেলেই ত হোল? ভাবিসনি ভাই, নিশ্চয় বল্‌ছি তোর উপায় কর্‌বো এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

বন্ধুর মুখের অন্ধকার ঘুচিয়া পুনরায় তাহাতে আশার আলোক দেখা দিল। বন্ধু ভাবিল, নরেন বড় লোকের ছেলে, বাপ উকিল, তাহার গান শিখিবার জন্য বেতন দিয়া ওস্তাদ রাখেন, নরেন হয় ত বাপকে বলিয়াই অক্ষম বন্ধুর কোন উপায় করিয়া লইবেন তাই তাঁহার এত আত্মপ্রত্যয়। রাজকুমার যখন বকেয়া বেতন না দিলে

পরীক্ষা দিতে পাঠাইবেন না, তখন নরেন নিশ্চয় টাকার জোগাড়ই করিবেন। বন্ধু এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নরেন্দ্র কলেজ হইতে বাটী আসিয়া হেদোর ধারে একটু আধটু বেড়াইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু বাটী না যাইয়া সিমুলিয়ার বাজারের সম্মুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে হেদোর দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাজারের একটু পশ্চিমে যাইয়া দক্ষিণে একটি গলি, গলির মোড়ের উপরেই গুলির একটি বৃহৎ আড্ডা। ইতিমধ্যে আড্ডায় যাইয়া নরেন আড্ডাধারীর সহিত চুপি চুপি দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আড্ডাধারী বিনা বাক্য-ব্যয়ে ঘাড় নাড়িয়া "না" বলিল। নরেন আবার হেদোর দিকে দুই চারিপদ অগ্রসর হইয়াই পার্শ্বের আর একটি গলির ভিতর যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘিরিয়াছে, বেশ গা ঢাকা মত হইয়াছে। এমন সময় গলির মুখে রাজকুমার আসিয়া উপস্থিত। অমনি নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পথরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, নরেন্দ্রনাথের দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়াই রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল, নিজ ভাব চাপিয়া কহিলেন "কিরে দত্ত, এখানে কেন?"

নরেন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কেন আর কি,

আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন মোশাই, আমি বেশ জানি—হরিদাসের অবস্থা বড়ই খারাপ, সে টাকা দিতে পারবে না। তাকে কিন্তু পাঠাতেই হবে, নইলে ছাড়বো না। যদি আমার কথা না রাখেন ত আমিও ইস্কুলে আপনার কথা রটাবো ; ইস্কুলে টেঁকা দায় করে তুলবো। এত ছেলের টাকা মাপ করলেন আর ওবেচারার কেন করবেন না ?"

স্থির-প্রতিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথের মুখের ভঙ্গি দেখিয়া রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আদর করিয়া নরেন্দ্রের গলদেশে হাত জড়াইয়া কহিলেন, "বাবা, রাগ করিস কেন ? তুই যা বলছিস তাই হবে, তাই হবে। তুই যখন বলছিস আমি কি তা কর্‌বো না ?"

নরেন্দ্র একটু বিরক্তির ভাণ করিয়া কহিলেন, "তবে কেন সকাল বেলা আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন ?"

রাজকুমার বলিলেন, "কি জানিস তোর দেখাদেখি সব ছোঁড়াগুলো যখন ঐ বায়না ধরবে তখন কাকে রেখে কাকে দেব, বাবা ? আমি তখন এক বিষম বিপদে পড়বো। আমায় আড়ালে বলতে হয়। তুই ছেলে মানুষ, ওসব ত বুঝিসনি, কারো সামনে কি কিছু বলে ? তুই

নিশ্চিন্ত হ। মাইনের টাকটা মাপ হবে, তবে ফীর টাকা ত আর মাপ হয় না, সেটা দেবে ত?"

নরেন্দ্র কহিলেন, "সেটার উপায় হতে পারে, তবে মাইনেটা আপনাকে ছেড়ে দিতেই হবে, সে এক পয়সা দিতে পারবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে" বলিয়া রাজকুমার আড্ডার আশে পাশে বেড়াইয়া, নরেন চলিয়া গেলে আড্ডায় ঢুকিলেন।

নরেন্দ্র বুড়োর ভাবগতিক দেখিয়া যাইতে যাইতে মুখে কাপড় চাপিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সহপাঠী বন্ধুটির বাসা নরেন্দ্রনাথের বাটী হইতে বেশী দূর নহে, চোর বাগানে ভুবনমোহন সরকারের গলিতে। পরদিন প্রত্যূষে বন্ধুর বাসায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়া বন্ধুর ঘরের দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে গান ধরিলেন,—

গান

ভয়রোঁ—ঝাঁপতাল

অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেম-মুখ-ছায়া
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে॥

মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভদিনে,
তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে,
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে
প্রেম উপহার লয়ে হৃদয়-থালে ॥

নরেনের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সহপাঠীরা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, "ওরে, খুব ফূর্ত্তি কর, তোর কাজ ফতে হয়েছে, তোর মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না।" এই বলিয়া পূর্ব্বদিনের সমস্ত ঘটনা—রাজকুমারকে ভয় দেখান, ভয়ে তাঁহার কি প্রকার মুখের বিকৃতি হইয়াছিল তাহার নকল, তার পর কেমন করিয়া প্রতিদিন এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া ফস্ করিয়া গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন ইত্যাদি নকলের সঙ্গে গল্প করায় সকলের মধ্যে মহা হাসির রোল উঠিল।

পরীক্ষার আর বেশী দেরী নাই; বোধ হয় মাস খানেকও নাই। বিপুল কলেবর ইংলণ্ডের ইতিহাস (Green's History of England) নরেন্দ্রনাথের একবারও পড়া হয় নাই। পরীক্ষায় পাশ হইতে হইবে বলিয়া নরেন্দ্রনাথের বিশেষ কোন চেষ্টা তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা দেখেন না, মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদের বাসায় চোরবাগানে একটু আধটু পড়াশুনা করিতে

যাইতেন বটে, কিন্তু তথায় যাইলে অধিক সময় কথাবার্ত্তা বা গান গাওয়াই হইত। তাঁহার মাতুলালয়ে যে ছোট ঘরটিতে নরেন্দ্র থাকিতেন তাহার উত্তরে দ্বিতলে তদপেক্ষা একটি বড় ঘর, এই ঘরের পশ্চিমে একটি চোর-কুঠরী বা দোছত্রির ঘর ছিল। ঐ বড় ঘরের ভিতর দিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশের একটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। হামাগুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতে হয়, এত ছোট। তাহার দক্ষিণদিকে একটি ছোট জানালা। এই সময় একদিন প্রাতে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার নিকট যাইয়া "নরেন" বলিয়া ডাকিলে নরেন উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু বন্ধুটি তাঁহাকে ঘরের মধ্যে চারিদিক খুঁজিয়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন। এমন সময় নরেন কহিলেন, "এই চোর কুঠরীর ভিতর আছি।" সেইখান হইতেই বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া হইল। পরে বন্ধু শুনিলেন, বিগত দুইদিন ঐ কুঠরীর মধ্যে বসিয়া নরেন ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিতেছেন; সংকল্প করিয়া বসিয়াছেন যে, একাসনে বসিয়া পাঠ শেষ করিয়া তবে কুঠরী হইতে বাহির হইবেন। নরেন্দ্র কার্য্যতঃও তাহাই করিলেন। তিন দিনে ঐ বিপুলকায় পুস্তকখানি পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন। পরীক্ষার দিন আসিল,

নরেনের কোনও উদ্বেগ বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোনও উৎকণ্ঠা দেখা গেল না।

আজ পরীক্ষার প্রথম দিন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নরেন শয্যা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে চোরবাগানে হরিদাস ও দাসরথির বাসায় উপস্থিত। বন্ধুরা এখনও শয্যায় শায়িত। তাঁহাদের ঘরের দ্বারে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন,—

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি ;
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত॥

নরেনের গলার আওয়াজ পাইয়া বন্ধুরা শশব্যস্তে উঠিয়া দরজা খুলিলেন ; দেখিলেন, নরেন আনন্দ-প্রদীপ্ত বদনে একখানি পুস্তক হাতে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন। হয়ত একটু পাঠ করিবেন ভাবিয়া বন্ধুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গান ধরিয়া যে

ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা ছুটাইলেন, তাহার অবরোধ করিয়া পড়াশুনা করা আর সেদিন হইল না। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত, "আমরা যে শিশু অতি", "অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি" প্রভৃতি গান ও গল্প চলিল। পাশের ঘরে নরেনের অপর একটি সহপাঠী বাস করিতেন। নরেনের গান প্রথম আরম্ভ হইলেই তিনি তথায় আসিয়া জুটিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ শুনিবার পর পরীক্ষার কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি গানের সভা পরিত্যাগ কালে বন্ধুভাবে নরেনকে পরীক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র একটু হাসিলেন মাত্র, কিন্তু গানের স্রোত থামিল না দেখিয়া বন্ধু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। একজন বন্ধু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন, একজামিনের দিন কোথায়? একটু আধটু খুঁৎখাঁৎ যা আছে সেটুকু সেরে নেবে, না তোমার দেখ্ছি সকলই বিপরীত, বেড়ে ফূর্ত্তি কর্ছো।"

নরেন উত্তর করিলেন, "হাঁ তাই ত কর্ছি, মাথাটা সাফ্ রাখছি, মগজটাকে একটু জিরেন্ দেওয়া চাই, নইলে এই দুঘণ্টা যা মাথায় ঢোকাবে সেটা ঢুকে আগেকার গুলোকে গুলিয়ে দেবে বই ত নয়? এতদিন পড়ে পড়ে যা হোল না, তাকি আর দুএক ঘণ্টায় হয়?—হয় না। একজামিনের দিন সকাল বেলায় কেবল ফূর্ত্তি, কেবল

ফূর্ত্তি করে শরীর মনকে একটু শান্তি দিতে হয়, ঘোড়াটা ছুটে এলে তাকে দলাই মলাই করে তাজা করে নিতে হয়। মগজটাকেও তাই কর্‌তে হয়।”

স্বামিজীর কথা

আমি নিজে অবশ্য বেদের ততটুকু মানি, যতটুকু যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের অনেক অংশ ত স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী। Inspired বা প্রত্যাদিষ্ট বল্‌তে পাশ্চাত্য-দেশে যেরূপ বুঝায়, বেদকে আমাদের শাস্ত্রে সেরূপ ভাবে প্রত্যাদিষ্ট বলে না। তবে উহা কি? না, ভগবানের সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি। এই জ্ঞানসমষ্টি যুগারম্ভে প্রকাশিত বা ব্যক্ত ও যুগাবসানে সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। যুগের আরম্ভ হলে উহা আবার প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের এই কথাগুলি অবশ্য ঠিক, কিন্তু কেবল 'বেদ' নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞানসমষ্টি, এ কথা মনকে আঁখিঠারা মাত্র। মনু এক স্থলে বলেছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির সঙ্গে মেলে, তাই বেদ, অপরাংশ বেদ নয়। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও এই মত।

*   *   *

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তার মোদ্দাটা এই যে, তাতে ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের স্থান নেই। আমরা আনন্দের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে খুব প্রস্তুত আছি।

*   *   *

বেদান্তের প্রথম কথা হচ্ছে, সংসার দুঃখময়, শোকের

আগার, অনিত্য ইত্যাদি। বেদান্ত প্রথম খুল্‌লেই দুঃখ, দুঃখ শুনে লোকে অস্থির হয়, কিন্তু তার শেষে পরম সুখ—যথার্থ সুখের কথা পাওয়া যায়। বিষয়-জগৎ, ইন্দ্রিয়-জগৎ থেকে যে যথার্থ সুখ হতে পারে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি, আর বলি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই যথার্থ সুখ। আর এই সুখ, এই আনন্দ সব মানুষের ভিতরই আছে। আমরা জগতে যে "সুখবাদ" দেখ্‌তে পাই, যে মতে বলে, জগৎটা পরম সুখের স্থান, তাতে মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ কোরে সর্ব্বনাশের দিকে নিয়ে যাবে।

* * *

আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বাস্তবিক ত্যাগ ব্যতীত আমাদের কোন দর্শনেরই লক্ষ্য বস্তু পাওয়া অসম্ভব। কারণ ত্যাগ মানেই হচ্ছে, আসল সত্য যে আত্মা, তার প্রকাশের সাহায্য করা। উহা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়, তার উদ্দেশ্য এই যে, সে সত্য-জগতের জ্ঞান লাভ করতে চায়, অথবা জগতের যথার্থ স্বরূপ কি তা জানতে চায়।

* * *

জগতে যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে বেদই কেবল

বলেন যে, বেদপাঠ করাটাও অপরা বিদ্যার সীমার ভিতর। পরা বিদ্যা হচ্ছে, যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। সে পড়ে হয় না, বিশ্বাস করে হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি অবস্থা লাভ করলে তবে সেই পরম পুরুষকে জানা যায়।

*　　　　*　　　　*

জ্ঞানলাভ হলে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না; তা বলে জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে ঘৃণা করেন, তা নয়। তিনি সকল সম্প্রদায়ের অতীত ব্রহ্মকে জেনে সব সম্প্রদায়ের অতীত অবস্থায় পৌঁছেন ও উহাতে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তিনি সম্প্রদায় সকলকে ভেঙ্গেচুরে ফেল্‌তে চেষ্টা করেন না, কিন্তু তাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেন। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে ও এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়, সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর কোন মত-ভেদ থাকে না।

*　　　　*　　　　*

জ্ঞানী বলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্ত্রী পুত্র পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্ছে, সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা।

*　　　　*　　　　*

মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃ পুনঃ

শরীর-ধারণে দেহ-মনের বিকাশ হবার স্নবিধে হয়, আর ভিতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হতে থাকে।

* * *

বেদান্ত মানুষের বিচার-শক্তিকে যথেষ্ট আদর করে থাকেন বটে, কিন্তু আবার এও বলেন যে, যুক্তি বিচারের চেয়েও বড় জিনিষ আছে। যুক্তি বিচারের সহায়তায় ওদের সীমার বাইরে যেতে হবে ও সেই জিনিষ লাভ করতে হবে।

* * *

ভক্তিলাভ কিরূপে হয়?

—ভক্তি তোমার ভেতরেই আছে, কেবল তার ওপর কামকাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেল্‌লেই ভক্তি আপনা আপনি প্রকাশ হবে।

* * *

জিব চল্‌লেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় চল্‌বে।

* * *

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম, এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে-পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে কর্ম্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।

* * *

ধর্ম্ম একটা কল্পনার জিনিষ নয়, প্রত্যক্ষ জিনিষ।

যে একটা ভূতও দেখেছে, সে অনেক বই-পড়া-পণ্ডিতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

*　　　*　　　*

এক সময়ে স্বামিজী কোন লোকের খুব প্রশংসা করেন, তাতে তাঁর নিকটস্থ জনৈক ব্যক্তি বলেন, "কিন্তু সে আপনাকে মানে না।" তাতে তিনি বলে উঠ্‌লেন, "আমাকে মান্‌তে হবে, এমন কিছু লেখা পড়া আছে? সে ভাল কাজ করছে, এই জন্যে সে প্রশংসার পাত্র।"

*　　　*　　　*

আসল ধর্ম্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশের কোন অধিকার নেই।

*　　　*　　　*

কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন-ভজন কোরে সিদ্ধ হও তার পর কর্ম্ম কর্‌বার অধিকার; কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম্ম কর্‌তে হবে, এর সামঞ্জস্য কোথায়?

—তোমরা দুটো জিনিষ গোল করে ফেল্‌ছো। কর্ম্ম মানে, এক জীব-সেবা আর এক প্রচার। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধ পুরুষ ছাড়া কারু অধিকার নেই। সেবায় কিন্তু সকলের অধিকার; শুধু অধিকার নয়, সেবা কর্‌তে সকলে বাধ্য, যতক্ষণ তারা অপরের সেবা নিচ্ছে।

*　　　*　　　*

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভেতর যেদিন থেকে বড় লোকের

খাতির আরম্ভ হবে, সেই দিন থেকে তাঁর পতনের আরম্ভ।

*　　　*　　　*

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভাবের (Feelings) যেরূপ বিকাশ হয়েছিল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

*　　　*　　　*

অসৎ কর্ম্ম করতে ইচ্ছে হয়, গুরুজনের সামনে করবে।

*　　　*　　　*

গোঁড়ামি দ্বারা খুব শীঘ্র ধর্ম্ম-প্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের স্বাধীনতা দিয়ে একটা উচ্চপথে তুলে দেওয়াতে দেরী হলেও পাকা ধর্ম্ম-প্রচার হয়।

*　　　*　　　*

সাধনের জন্যে যদি শরীর যায়, গেলই বা।

*　　　*　　　*

সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতেই ধর্ম্মলাভ হয়ে যাবে।

*　　　*　　　*

গুরুর আশীর্ব্বাদে শিষ্য না পড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়।

*　　　*　　　*

গুরু কাকে বলা যায়?

—যিনি তোমার অন্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কার-রাশি দেখতে পান এবং তারা ভূতকালে তোমাকে কি ভাবে নিয়মিত করেছে এবং ভবিষ্যতে কোন্ দিকে চালাবে

অর্থাৎ তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।

* * *

আচার্য্য যে-সে হতে পারেন না, কিন্তু মুক্ত অনেকে হতে পারে। মুক্ত যে, তার কাছে সমুদয় জগৎ স্বপ্নবৎ, কিন্তু আচার্য্যকে উভয় অবস্থার মাঝখানে থাকতে হয়। তাঁর জগৎকে সত্য জ্ঞান চাই, না হলে তিনি কেন উপদেশ দেবেন? আর যদি তাঁর স্বপ্নজ্ঞান না হোলো, তবে তিনি ত সাধারণ লোকের মত হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন? আচার্য্যকে শিষ্যের পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান আচার্য্যদের শরীরে ব্যাধি আদি হয়। কিন্তু কাঁচা হলে তাঁর মনকে পর্য্যন্ত তারা আক্রমণ করে, তিনি পড়ে যান। আচার্য্য যে-সে হতে পারেন না।

* * *

এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় বলে বুঝতে পারবে।